হযরত ইমাম গাযালী (র)

সৌভাগ্যের পরশমণি

তৃতীয় খণ্ড ঃ বিনাশন

আবদুল খালেক
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচিপত্র

বিনাশন খণ্ডে বর্ণিত বিষয়			৯
প্রথম অধ্যায়	ঃ	চরিত্র সংশোধনের সাধনা ও কুস্বভাব বর্জনের উপায়	১১
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঃ	ভোজন-লিপ্সা ও কামরিপু	৫১
তৃতীয় অধ্যায়	ঃ	বাহুল্য কথন-লালসা বর্জনের উপায় ও রসনার আপদ	৭৭
চতুর্থ অধ্যায়	ঃ	ক্রোধ, বিদ্বেষ, ঈর্ষা এবং উহা হইতে পরিত্রাণের উপায়	১১৯
পঞ্চম অধ্যায়	ঃ	সংসারাসক্তি ও ইহা হইতে অব্যাহতির উপায়	১৪৭
ষষ্ঠ অধ্যায়	ঃ	মালের মহব্বত, ধনাসক্তির প্রতিকার ও কৃপণতার বিপদসমূহ	১৬৫
সপ্তম অধ্যায়	ঃ	সম্মান-লালসা ও প্রভুত্ব-প্রিয়তার প্রতিকার এবং এতদুভয়ের বিপদসমূহ	২০১
অষ্টম অধ্যায়	ঃ	রিয়া ও ইহা হইতে অব্যাহতির উপায়	২১৯
নবম অধ্যায়	ঃ	অহংকার ও আত্মগর্ব	২৫৭
দশম অধ্যায়	ঃ	উদাসীনতা, অজ্ঞানতাজনিত ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার প্রতিকার	২৯৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সৌভাগ্যের পরশমণি

তৃতীয় খণ্ড ঃ বিনাশন

বিনাশন খণ্ডে বর্ণিত বিষয়

ধর্মপথে অগণিত বিপদসমাকীর্ণ ভয়াবহ স্থান আছে, ইহাদিগকে মুহ্‌লিকাত বা মারাত্মক বিনাশের স্থান বলে। অসাবধানতাবশত এই বিপদসমাকীর্ণ স্থানসমূহে পতিত হইলে মানুষ তাহার উৎকৃষ্ট গুণরাজি হারাইয়া সমূলে বিনষ্ট হয়। এই বিনাশের স্থানসমূহ কি, উহাদের হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি, এই খণ্ডে তৎসমুদয় বর্ণিত হইবে এবং দশটি অধ্যায়ে এই খণ্ড সমাপ্ত হইবে।

প্রথম অধ্যায় ঃ রিয়াযত বা চরিত্র সংশোধনের জন্য কঠোর সাধনা; মন্দ স্বভাব বর্জন ও সৎস্বভাব অর্জন করিবার উপায়।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ কামভাব ও অতিরিক্ত পানাহারের অপকারিতা এবং এই দুই কুপ্রবৃত্তি দমনের উপায়।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ বাহুল্য কথনের অপকারিতা ও ইহার প্রতিকার এবং রসনার বিপদসমূহ।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ ক্রোধ ও ঈর্ষা দমনের উপায় এবং ইহাদের বিপদসমূহ।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ দুনিয়ার মহব্বত অর্থাৎ সংসারাসক্তির প্রতিকার এবং 'দুনিয়ার মহব্বত সকল গোনাহ্‌র মূল' উক্তির তাৎপর্য।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ মালের মহব্বত অর্থাৎ ধনাসক্তির প্রতিকার ও কৃপণতার বিপদসমূহ।

সপ্তম অধ্যায় ঃ সম্মান-লালসা ও প্রভুত্ব-প্রিয়তার প্রতিকার এবং এতদুভয়ের বিপদসমূহ।

অষ্টম অধ্যায় ঃ ইবাদতে রিয়া অর্থাৎ প্রদর্শনেচ্ছা, কপটতা এবং নিজকে পুণ্যবান ও সাধু বলিয়া প্রকাশ করারূপ ব্যাধিসমূহের প্রতিকার।

নবম অধ্যায় ঃ অহঙ্কার ও আত্মগর্ব এবং স্বীয় কাজ উত্তম বলিয়া মনে করার অপকারিতা; উহাদের প্রতিকার।

দশম অধ্যায় ঃ উদাসীনতা, অজ্ঞানতাজনিত ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার প্রতিকার।

মানুষের মন্দ স্বভাবের মূলসমূহ এই দশটি অধ্যায়ে বর্ণিত হইল। এই মূলগুলি হইতেই অন্যান্য সমস্ত দোষ-ত্রুটি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ধর্মপথে বিচরণকালে মানবকে বিপদসমাকীর্ণ এই দশটি স্থান পার হইতে হয়। যিনি এই দশটি স্থান নিরাপদে অতিক্রম করিতে পারেন, তিনি কুস্বভাবের মলিনতা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া স্বীয় অন্তরের পবিত্রতা লাভ করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহার অন্তর এইরূপ উপযুক্ত হইয়া উঠে যে, তিনি ঈমানের গূঢ় তত্ত্বসমূহ– যথা, মা'রিফাত অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পরিচয়-জ্ঞান, আল্লাহ্-প্রেম, আল্লাহ্‌র একত্ব জ্ঞান, আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরশীলতা ইত্যাদি হিতকর গুণরাজি ও ঈমানের উজ্জ্বল পরিচ্ছদে সুশোভিত হইতে পারেন।

প্রথম অধ্যায়

চরিত্র সংশোধনের সাধনা ও কুস্বভাব বর্জনের উপায়

প্রথমত এই অধ্যায়ে সৎস্বভাবের ফযীলত বর্ণনা করা হইবে। তৎপর ইহার হাকীকত বর্ণিত হইবে। ইহার পর দেখান হইবে যে, মানুষের পক্ষে সৎস্বভাব অর্জন করা অসম্ভব নহে। তৎপর ইহা অর্জনের উপায় শিক্ষা দেওয়া হইবে। তাহার পর নিজের দোষ চিনিবার প্রণালী, সৎস্বভাবের নিদর্শনাবলী বর্ণিত হইবে। শেষে শিশুদের প্রতিপালন এবং তাহাদিগকে নীতিপরায়ণ ও সৎস্বভাবী করিয়া তোলার উপায়-পদ্ধতি নির্দেশিত হইবে। পরিশেষে মুরীদের প্রাথমিক রিয়াযতের উপায় ও ইহার পথ প্রদর্শন করা হইবে।

সৎস্বভাবের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতিদান— আল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উৎকৃষ্ট স্বভাবী বলিয়া প্রশংসা করত বলিয়াছেন ঃ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ অর্থাৎ "হে মুহাম্মদ (সা), আপনি অত্যন্ত উন্নত ও সৎস্বভাবের অধিকারী।" হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন– "সৎস্বভাবের উন্নত আদর্শ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।" অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন– "কেবল সৎস্বভাবকে দাঁড়ির এক পাল্লায় স্থাপন করিয়া অন্যান্য সমুদয় বস্তু অপর পাল্লায় স্থাপন করিলে সৎস্বভাবই অধিক ভারী হইবে।"

এক ব্যক্তি রাসূলে মাক্‌বূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া আরয করিল– "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, ধর্ম কি বস্তু?" তিনি বলিলেন– "সৎস্বভাব।" ঐ ব্যক্তি ডানে-বামে ঘুরিয়া ফিরিয়া বারবার ঐ একই প্রশ্ন করিতেছিল এবং তিনি প্রত্যেকবারই ঐ একই উত্তর দিতেছিলেন। অবশেষে রাসূলে মাক্‌বুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন– "তুমি কি অবগত নও যে, ক্রোধের বশীভূত না হওয়াকেই ধর্ম বলে?"

লোকে রাসূলে মাক্‌বূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল– "কোন্ বস্তু সর্বোত্তম?" তিনি ফরমাইলেন– "সৎস্বভাব।" এক ব্যক্তি রাসূলে মাক্‌বূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিল– "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন।" তিনি বলিলেন– "তুমি যে স্থানেই থাক না কেন, আল্লাহ্‌কে ভয় করিবে।" সেই ব্যক্তি নিবেদন করিল– "আরও উপদেশ দিন।" তিনি ফরমাইলেন– "তোমার দ্বারা অকস্মাৎ কোন খারাপ কার্য হইয়া পড়িলে, পরক্ষণেই কোন না কোন সৎকর্ম করিবে, তাহা হইলে এই সৎকর্ম উক্ত অসৎকর্ম চুকাইয়া ফেলিবে।" সেই ব্যক্তি আবার নিবেদন করিল– "আরও কিছু উপদেশ প্রদান করুন।" তিনি বলিলেন– "প্রফুল্লাত ও সৎস্বভাবের সহিত লোকদের সঙ্গে মিলিবে।" অন্যত্র

রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,- "আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে সৎস্বভাব ও সুন্দর চেহারা দান করিয়াছেন তাহাকে তিনি দোযখে নিক্ষেপ করিবেন না।"

কতিপয় লোক একদা রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল- "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, অমুক স্ত্রীলোক সর্বদা রোযা রাখে এবং সমস্ত রাত্রি নামায পড়ে, কিন্তু তাহার স্বভাব বড় খারাপ; অশ্লীল ও কর্কশ বাক্যে প্রতিবেশীদিগকে অহরহ কষ্ট দিয়া থাকে।" ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি বলেন- "তাহার স্থান দোযখ।" তিনি অন্যত্র বলেন- 'সির্কা যেমন মধুকে বিনষ্ট করে, কুস্বভাবও সেইরূপ মানুষের ইবাদতসমূহকে বিনষ্ট করিয়া দেয়।"

অনেক সময় রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এইরূপ প্রার্থনা করিতেন- "হে আল্লাহ্, আমার শারীরিক আকৃতি যেমন সুন্দর করিয়াছ, আমার প্রকৃতিও সেইরূপ সুন্দর কর।" তিনি আরও বলিতেন- "হে আল্লাহ্, তোমার নিকট আমি স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সৎস্বভাব প্রার্থনা করিতেছি।"

একদিন কতিপয় লোক রাসূলে মাক্‌বূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল- "আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে যাহা দান করিয়াছেন, তন্মধ্যে কোন্ পদার্থ সর্বোৎকৃষ্ট?" তিনি বলেন, "সৎস্বভাব।" তিনি আরও বলেন- "বরফ যেমন সূর্যের উত্তাপে গলিয়া যায়, সৎস্বভাব সেইরূপ গোনাহ্সমূহ নষ্ট করিয়া ফেলে।"

হযরত আবদুর রহমান সাম্‌রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন- "রাসূলে মাক্‌বুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আমি উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় তিনি ফরমাইলেন- 'গতকল্য আমি একটি বিস্ময়কর ঘটনা দর্শন করিয়াছি যে, আমার উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তি আল্লাহ্র দরবারে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া রহিয়াছে; কিন্তু তাহার সম্মুখে পর্দা ছিল বলিয়া আল্লাহ্র দর্শন লাভ করিতে পারিতেছিল না। সেই সময় তাহার সৎস্বভাব আগমন করিয়া পর্দাটি দূর করত তাহাকে আল্লাহ্র নিকট পৌঁছাইয়া দিল।"

রাসূলে মাক্‌বূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- "সৎস্বভাবের ফলে মানব 'ছায়িমুদ্দাহ্র' ও 'কায়িমুল্লায়লের' মর্যাদা লাভ করিতে পারে।" অর্থাৎ সারা বৎসর রোযা রাখিলে ও সমস্ত রজনী জাগ্রত থাকিয়া নামায পড়িলে যে মর্যাদা লাভ করা যায়, কেবল সৎস্বভাবের ফলে সেই মর্যাদা লাভ করা যায়। ইবাদত কম করিলেও সেই ব্যক্তি পরকালে বড় বড় আসন লাভ করিবে।

রাসূলে মাক্‌বূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বভাব অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ ও মহৎ ছিল। একদা কতিপয় স্ত্রীলোক তাঁহার সম্মুখে গোলমাল করিতেছিল। এমন সময় হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তথায় উপস্থিত হইলে তাহারা সরিয়া গেল। ইহা দেখিয়া হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু স্ত্রীলোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন- "হে

শত্রুগণ, তোমরা আমাকে ভয় কর, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভয় কর না?" তাহারা বলিল- "আপনি রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপেক্ষা অনেক তীব্র ও কঠিন।" রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- "হে ইব্নে খাত্তাব (অর্থাৎ ওমর), যে আল্লাহ্র হস্তে আমার জীবন তাঁহার শপথ, শয়তান তোমাকে দর্শন করা মাত্র ভয় পায় এবং যে পথে তুমি আগমন কর, সেই পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথে পলায়ন করে।"

হযরত ফুযাইল ইব্ন-আইয়ায (র) বলেন- "কুস্বভাবী আলিমের সংসর্গ অপেক্ষা সৎস্বভাবী কুকর্মীর সংসর্গ আমার নিকট অধিকতর পছন্দনীয়।" এক কুস্বভাবী ব্যক্তির সহিত পথে হযরত ইব্ন মুবারক (র)-এর সাক্ষাত ঘটিল। কিছুক্ষণ উভয়ে একত্রে পথ চলার পর পৃথক হইয়া সেই ব্যক্তি অন্যদিকে যাইতে লাগিল। ইহাতে হযরত ইব্ন-মুবারক (র) রোদন করিতে লাগিলেন। লোকে তাঁহাকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তিনি উত্তরে বলিলেন- "ঐ দুর্ভাগা আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার স্বভাবটি অপরিবর্তিতভাবে সাথে লইয়া গেল। এতক্ষণ আমার সংসর্গে থাকিয়াও স্বীয় চরিত্র সংশোধন করিয়া লইতে পারিল না, এই জন্যই আমি রোদন করিতেছি।"

হযরত কাত্তানী (র) বলেন- "সৎস্বভাবী ব্যক্তি সূফী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি সৎস্বভাবে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি আমা অপেক্ষা অধিক সূফী। হযরত ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মু'আয (র) বলেন- "কুস্বভাব এত বড় গোনাহ্ যে, তাহার বিপক্ষে কোন ইবাদতই সুফল দান করিতে পারে না এবং সৎস্বভাব এত বড় ইবাদত যে, কোন গোনাহ্ই তাহার ক্ষতি করিতে পারে না।"

সৎস্বভাবের হাকীকত— আলিমগণ সৎস্বভাবের মূলতত্ত্ব ও পরিচয় দিতে যাইয়া বিভিন্নরূপ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। যিনি যাহা বুঝিয়াছেন তিনি তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু ইহার পূর্ণ পরিচয় কেহই প্রদান করেন নাই। কেহ প্রসন্ন বদনকে সৎস্বভাবের নিদর্শন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ অপরের প্রদত্ত যাতনা সহ্য করাকে সৎস্বভাবের নিদর্শন বলিয়াছেন। কেহ-বা প্রতিশোধ গ্রহণ না করাকে সৎস্বভাবের চিহ্ন বলিয়াছেন। এইরূপে যাঁহার হৃদয়ে যেরূপ উদয় হইয়াছে, তিনি সেইভাবেই সৎস্বভাবের লক্ষণাদি বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুত এই সকল সৎস্বভাবের শাখা-প্রশাখা মাত্র; ইহার পূর্ণ পরিচয় নহে। আমরা ইহার পূর্ণ পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করিব।

দুই প্রকার বস্তু দিয়া আল্লাহ্ মানবজাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন; একটি শরীর ও অপরটি আত্মা। চর্মচক্ষু দ্বারা আমরা শরীর দেখিতে পারি কিন্তু জ্ঞান-চক্ষু ব্যতীত আত্মার দর্শন লাভ করিতে পারি না। এর উভয় বস্তুই অবস্থা বিশেষে সুন্দর হইয়া থাকে, আবার অবস্থা বিশেষে কুশ্রী হয়। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ সুশ্রী হইলে ইহাকে শারীরিক সৌন্দর্য বলে, আর অন্তরের আভ্যন্তরীণ আকৃতি সুশ্রী হইলে ইহাকে স্বভাবের সৌন্দর্য বলে।

শুধু শরীরের অঙ্গবিশেষ যেমন, চক্ষু, ওষ্ঠ ইত্যাদি যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুন্দর ও একের সহিত অপরের মিল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হইলেই তাহাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর বলা যাইতে পারে। তদ্রূপ মানব হৃদয়ের বৃত্তিসমূহ ঠিকভাবে বিকাশপ্রাপ্ত না হইলে সেই হৃদয়কেও সুন্দর বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে না।

সৎস্বভাব অর্জনের উপায়—হৃদয়ের সমুদয় বৃত্তি বা শক্তিসমূহ মোটামুটি চারিটি প্রধান ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। যথা ঃ (১) জ্ঞান-শক্তি, (২) ক্রোধ বা শাসন-ক্ষমতা, (৩) কামশক্তি বা লোভ-লালসা, (৪) এই তিনটি শক্তিকে মধ্যপন্থায় অর্থাৎ সমীচীন ও সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখিবার বিচার-শক্তি।

জ্ঞানকে এই স্থানে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অর্থে গ্রহণ করা হইল। এই শক্তি পূর্ণভাবে বিকাশপ্রাপ্ত ও স্ফূর্ত হইলে লোকের কথোপকথনের মধ্যে কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি মিথ্যা উপলব্ধি করা যায়, কাজ-কর্মের মধ্যে কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ তারতম্য করিয়া লওয়া যায় এবং ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি অসত্য নিরূপণ করা চলে। এই জ্ঞান-শক্তি উপযুক্তরূপে বিকশিত হইলে মানবহৃদয় জ্ঞানের উৎস হইয়া যায় এবং তখন ইহা মানুষের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া পরিগণিত হয়। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَنْ يُّؤْتَى الْحِكْمَا فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا অর্থাৎ "আর যাহার হিক্‌মত অর্থাৎ ধর্মজ্ঞান হাসিল হয়, তাহার প্রচুর কল্যাণের বস্তু হাসিল হয়।"

ক্রোধ বা শাসন-ক্ষমতা যখন ধর্মজ্ঞান ও শরীয়তের আজ্ঞাবহ থাকে, তাহাদের আদেশে উঠা-বসা করে, তখনই ইহাকে উত্তম বলা যায়। কামশক্তি বা লোভ-লালসাও তদ্রূপ ধর্মজ্ঞান ও শরীয়তের অবাধ্য না হইয়া আজ্ঞাধীন হইয়া চলিলে এবং সেই আজ্ঞাধীনতা তাহার জন্য সহজ ও সুখকর হইলে তাহাকেও উত্তম বলা যায়। ক্রোধ ও লোভ-লালসাকে খর্ব বা বৃহৎ দেখিলে যে শক্তি ন্যায্যবিচার করত খর্বকে বৃহৎ করিয়া ও বৃহৎকে খর্ব করিয়া বরাবর ও সামঞ্জস্যশীল করিয়া দেয়, সেই শক্তি যখন ধর্ম ও বুদ্ধির ইঙ্গিতে চলে, তখন ইহাকেও সুন্দর বলা যায়।

ক্রোধকে শিকারী কুকুরের সঙ্গে, লোভকে ঘোড়ার সঙ্গে এবং বুদ্ধিকে স্বয়ং শিকারীর সঙ্গে তুলনা করা চলে। ঘোড়া কখনও অবাধ্য ও হটকারী, আবার কখনও শিষ্ট ও শায়েস্তা হইয়া থাকে। শিকারী কুকুরও কখন কখন আজ্ঞানুবর্তী হইয়া থাকে, কখন কখন আবার বিগড়াইয়া যায়। ঘোড়াটি বেশ শিষ্ট ও কুকুরটি আজ্ঞাধীন না হইলে শিকারী শিকার ধরিবার কোন আশা করিতে পারে না; বরং ইহাতে শিকারীর প্রাণ হারাইবার আশঙ্কা থাকে। অবাধ্য ঘোড়া শিকারীকে পৃষ্ঠ হইতে ফেলিয়া দিয়া ও কুকুর বিগড়াইয়া গিয়া স্বীয় প্রভুকে কামড়াইয়া মারিয়া ফেলিতে পারে।

ক্রোধ ও লোভকে বুদ্ধি ও ধর্মের আজ্ঞাবহ করিয়া রাখাই বিচারশক্তির কাজ। বিচারশক্তি কখন কখন লোভকে ক্রোধের উপর চাপাইয়া দিয়া ক্রোধের অবাধ্যতা খর্ব করিয়া দেয়; আর কখন কখন লোভের কামনাকে খর্ব করিবার নিমিত্ত তাহার উপর

ক্রোধকে দণ্ডধারীরূপে নিয়োজিত করিয়া ইহাকে আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করে। এই চারি প্রকারে শক্তি বা বৃত্তি সমান অনুপাতে বিকশিত হইয়া নিজ নিজ কার্য ঠিকভাবে সুসম্পন্ন করিলেই সৎস্বভাব পূর্ণতা লাভ করে। ইহাদের দুই একটি শক্তি বা বৃত্তি উত্তম হইলেই স্বভাবকে সুন্দর বলা যায় না; যেমন কোন ব্যক্তির ওষ্ঠ সুন্দর, কিন্তু চক্ষু কদাকার অথবা চক্ষু সুন্দর, কিন্তু নাসিকা কদাকার হইলে তাহাতে সর্বাঙ্গ-সুন্দর বলা চলে না।

কুস্বভাবের কারণ— উক্ত চারিটি শক্তির সমুদয়ই কুৎসিত হইয়া গেলে স্বভাবও পূর্ণরূপে কুৎসিত হইয়া যায় এবং এইরূপ স্বভাববিশিষ্ট লোক দ্বারা সর্ববিধ কুকর্ম সংঘটিত হয়। দ্বিবিধ কারণে এই শক্তিসমূহ বিশ্রী ও জঘন্য হইয়া পড়ে। প্রথমত প্রত্যেকটি শক্তি যে পরিমাণে বিকশিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া উচিত, ইহা সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে ইহা বিশ্রী ও জঘন্য হইয়া যায়। দ্বিতীয়ত প্রত্যেকটি শক্তি যে পরিমাণে বিকশিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া উচিত, সেই সীমা হইতে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া বিকল ও শক্তিহীন হইয়া গেলেও ইহা বিশ্রী ও জঘন্য হইয়া থাকে।

জ্ঞানশক্তি সীমা অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং মন্দ কার্যে ইহাকে নিয়োজিত করিলে ইহা হইতে তখন প্রতারণা, কপটতা ও জ্ঞান-গর্ব জন্ম হইয়া থাকে। ইহাই আবার পরিমিতরূপে বিকশিত না হইয়া খর্ব হইয়া গেলে নির্বুদ্ধিতা, মূর্খতা ও হঠকারিতা উৎপন্ন হয়। সেই জ্ঞানশক্তি পরিমিতরূপে বিকশিত ও স্ফূর্ত হইলে মানুষ উত্তমরূপে কার্যাদি পরিচালন ও বিচারে অভ্রান্ত অভিমত প্রকাশ করিতে পারে এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ ও দূরদর্শিতা অর্জন করিত সমর্থ হয়।

ক্রোধ সীমা ছাড়াইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে দুঃসাহসিকতা জন্মে; আবার পরিমিতরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইলে কাপুরুষতা ও ভীরুতা উৎপন্ন হয়। আবার ক্রোধ পরিমিতরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অত্যল্পতা ও অত্যধিকতার দোষে দুষ্ট না হইলে সৎসাহস উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সৎসাহস হইতে বদান্যতা, বীরত্ব, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, নির্ভয়তা, ক্রোধ নিবারণের শক্তি এবং তদনুরূপ অন্যান্য সৎস্বভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ক্রোধ সীমা অতিক্রম করিয়া বর্ধিত হইলে দুঃসাহসিকতা উৎপন্ন হয়, মানুষকে বিপদসঙ্কুল কার্যে নিক্ষেপ করে এবং তখন তদনুরূপ কুস্বভাবসমূহ উৎপন্ন হয়। ক্রোধের স্বল্পতার দরুন কাপুরুষতা ও ভীরুতা জন্মে এবং ইহা হইতে আবার আত্ম-অমর্যাদা, অসহায়তা, পরপদ-লেহন, চাটুকারিতা ইত্যাদি কুস্বভাব উৎপন্ন হয়।

সেইরূপ কামশক্তি বা লোভ-লালসা সীমার অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইলে দুরাশা, দুরাকাঙ্ক্ষা জন্মে। ইহা হইতেই কামুকতা, অপবিত্রতা, কলুষতা, অকৃতজ্ঞতা, ধনীদের নিকট দীনতা-হীনতা স্বীকার এবং দীনহীন দরিদ্রের প্রতি অবজ্ঞা জন্মে। আর তদনুরূপ মন্দ স্বভাবগুলি পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া মানুষকে কুস্বভাবী করিয়া তোলে। আবার এই কামশক্তি বা লোভ-লালসা নিয়মিত ও পরিমিতরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া মধ্যপন্থা অবলম্বন করিলে ইহাকে পরহেযগারী বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই

পরহেযগারী হইলে লজ্জা, অল্পে তুষ্টি, সরলতা, সহিষ্ণুতা, রসজ্ঞতা, অপরের মন আকর্ষণের ক্ষমতা ও গুণগ্রাহিতা ইত্যাদি সদগুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মধ্যপন্থা—মোটের উপর ঐ সকল শক্তি বা বৃত্তির দুই প্রান্ত রহিয়াছে এবং এই উভয় প্রান্তই খারাপ। এই দুই প্রান্তের ঠিক মধ্যস্থলে চুল অপেক্ষা সূক্ষ্ম একটি সরল ও উৎকৃষ্ট মধ্যপন্থা রহিয়াছে, ইহাকে সিরাতুল মুস্তাকীম বা মধ্যপথ বলে। ইহা পুলসিরাত সদৃশ সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ ধারবিশিষ্ট। যিনি জীবদ্দশায় এদিক ওদিক না হইয়া সোজা এই মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন, তিনি নিরাপদে ও নির্ভয়ে পুলসিরাত অতিক্রম করিয়া যাইবেন। এই জন্যই আল্লাহ্ মানুষকে স্বভাবে উক্ত উভয় প্রান্ত পরিত্যাগ করত মধ্যপথ অবলম্বনের আদেশ প্রদান করিয়া বলিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا

অর্থাৎ "এবং তাহারা যখন ব্যয় করে, অপব্যয় করে না ও কৃপণতাও করে না, (বরং) এতদুভয়ের মধ্যপথে দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান থাকে।" (সূরা ফুরকান, রুকু-৬)

রাসূলে মাক্‌বূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ অর্থাৎ "এবং তুমি নিজের হাত নিজের গলার সহিত বাঁধিয়া রাখিও না, আর ইহাকে সম্পূর্ণভাবে খুলিয়াও দিও না; (যাহাতে তোমার সমস্তই ব্যয় হইয়া যায় এবং তুমি অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়।") (সূরা বানী ইসরাঈল, রুকূ ৩, পারা ১৫।)

দেহের বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের আকৃতি পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুন্দর হইলেই যেমন মানুষকে সর্বাঙ্গ সুন্দর বলা যায় তদ্রূপ আভ্যন্তরীণ বৃত্তিগুলিই অনুমিতরূপে মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া বিকশিত হইলেই স্বভাবকে সর্বাঙ্গ সুন্দর বলা যাইতে পারে।

স্বভাবের বিভাগ—মানুষের স্বভাবকে প্রধানত চারি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

প্রথম শ্রেণী— যাহার প্রত্যেকটি মানসিক বৃত্তি পূর্ণভাবে বিকশিত ও স্ফূর্ত হইয়া সর্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে, তাহার স্বভাবকে প্রথম শ্রেণীর পূর্ণমাত্রার সর্বাঙ্গ সুন্দর বলা হয়। এইরূপ মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ ও অনুকরণ করিয়া চলা জগদ্বাসীর অবশ্য কর্তব্য। হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্য কেহই এইরূপ আদর্শ, সর্বাঙ্গ সুন্দর ও উন্নত সৎস্বভাব লাভ করিতে পারে নাই। আল্লাহ্ তদানীন্তনকালে যেমন হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সাল্লামকে সর্বাঙ্গ সুন্দর দৈহিক দান করিয়াছিলেন তদ্রূপ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বাঙ্গ সুন্দর মানসিক সৌন্দর্য প্রদান করত চিরকালের জন্য জগতের আদর্শ করিয়া রাখিলেন।

দ্বিতীয় শ্রেণী— যাহার হৃদয়ের সমস্ত বৃত্তি বা শক্তি পূর্ণমাত্রায় কুশ্রী, তাহার স্বভাবও পূর্ণমাত্রায় জঘন্য ও অসুন্দর। মানব সমাজ হইতে এইরূপ জঘন্য প্রকৃতির

লোককে বাহির করিয়া দেওয়া উচিত। সে মানবরূপী শয়তান। শয়তানের অন্তর ও মানসিক বৃত্তিগুলি পূর্ণমাত্রায় জঘন্য এবং এইজন্যই সে এতদূর কদর্য ও মন্দ হইয়াছে।

তৃতীয় শ্রেণী— পূর্ণমাত্রায় কুস্বভাব ও পূর্ণমাত্রায় সৎস্বভাব এতদুভয়ের মধ্যবর্তী, কিন্তু পূর্ণমাত্রায় সৎস্বভাবের অধিকতর নিকটবর্তী স্বভাবকে তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

চতুর্থ শ্রেণী— পূর্ণমাত্রায় কুস্বভাব ও পূর্ণমাত্রায় সৎস্বভাবের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় কুস্বভাবের অধিকতর নিকটবর্তীটিকে চতুর্থ শ্রেণীর স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

সাধারণত দেখা যায়, মধ্যবর্তী সুশ্রী ও মধ্যবর্তী কুশ্রী লোক জগতে অধিক; শারীরিক সৌন্দর্যেও পূর্ণমাত্রায় সুশ্রী বা পূর্ণমাত্রায় কুশ্রী লোক অত্যন্ত বিরল। স্বভাব সম্বন্ধেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। পূর্ণমাত্রায় সৎস্বভাব জগতে অতি বিরল হইলেও ইহার নিকটবর্তী ভাল স্বভাব অর্জনের জন্য প্রতিটি নর-নারীকে আপ্রাণ চেষ্টা করা অবশ্য কর্তব্য। স্বভাবের প্রতিটি বৃত্তিকে সুশ্রী করিতে না পারিলেও অধিকাংশগুলিকে সুশ্রী করিবার চেষ্টা করা উচিত। শারীরিক সৌন্দর্য ও কদর্য মূর্তির মধ্যস্থলে যেমন কোন বিভাগ চিহ্ন নাই, সৎস্বভাব ও মন্দস্বভাবের মধ্যেও সেইরূপ কোন স্পষ্ট সীমারেখা নাই। সৎস্বভাবের শাখা-প্রশাখা অসংখ্য। তথাপি উহাদিগকে চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা ঃ- (১) জ্ঞানশক্তি বা বুদ্ধি, (২) শাসনশক্তি বা ক্রোধ, (৩) কামশক্তি বা লোভ এবং (৪) এই তিনটি বৃত্তির প্রত্যেকটিকে অপরের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার বিচারশক্তি। এই চারি শ্রেণীর শক্তিই মানব স্বভাবের মূল শাখা। উহা হইতে অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বহির্গত হইয়াছে।

সৎস্বভাব অর্জন— মানুষ চেষ্টা দ্বারা স্বভাবের উন্নতি করিয়া সৎস্বভাব অর্জন করিতে পারে। কিন্তু কেহ কেহ বলিয়া থাকে, আল্লাহ্ যাহাকে যেরূপ আকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছেন শত চেষ্টা করিয়াও ইহার পরিবর্তন পরিবর্ধন করা যায় না; যেমন, কোন উপায়ে লম্বা মানুষকে খর্ব বা খর্ব মানুষকে লম্বা এবং সুন্দর আকৃতিকে কদাকার আকৃতিতে ও কদাকার আকৃতিকে সুন্দর আকৃতিতে পরিবর্তন করা যায় না। এইরূপ মানসিক বৃত্তি বা স্বভাবকেও পরিবর্তন করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু এই উক্তি সম্পূর্ণ ভ্রান্তিপূর্ণ। মানবস্বভাব অপরিবর্তনীয় হইলে নীতি-শিক্ষা, চরিত্র সংশোধনের জন্য সাধনা ও পরিশ্রম, উপদেশ প্রদান ইত্যাদি নিরর্থক ও বৃথা হইত।

রাসূলে মাক্‌বূল্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- "তোমাদের স্বভাবকে সুন্দর কর।" স্বভাবের উন্নতি সাধন সম্ভব না হইলে তিনি কখনও এইরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন না। চেষ্টা করিলে পশুকেও আজ্ঞাবহ করা যায় এবং বন্য পশুও পোষ মানিতে বাধ্য হয়। সুতরাং মানবস্বভাব সম্বন্ধে ঐরূপ উক্তি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন। মানুষের সকল কার্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর উপর তাহার কোন ক্ষমতা চলে না; যেমন খোরমার বীচি হইতে কেহই সেব বৃক্ষ জন্মাইতে পারে না।

কিন্তু খোরমার অঙ্কুর যত্নের সহিত প্রতিপালিত করিয়া উত্তম বৃক্ষ উৎপন্ন করিতে পারা যায়। মানবস্বভাব সম্বন্ধেও এই নিয়ম খাটে।

ক্রোধ ও লোভকে আজ্ঞাবহ রাখার প্রতিবন্ধক— মানব হৃদয়ে ক্রোধ ও লোভের যে বীজ রহিয়াছে শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাহা উৎপাটন করা যায় না; কিন্তু কঠোর সাধনা ও যত্নের দ্বারা ইহাকে আজ্ঞাধীন ও সমতার মধ্যে আনয়ন করা যায়। পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। তাহা হইলেও ক্রোধ এবং লোভকে শাসনে রাখা কঠিন কার্য সন্দেহ নাই। ইহা কঠিন হওয়ার দুইটি কারণ রহিয়াছে। প্রথম, জন্মগতভাবেই কাহারও অন্তরে ক্রোধ ও লোভ অত্যন্ত বলবান। দ্বিতীয়, বহুদিন কেহ লোভ ও ক্রোধের আজ্ঞাধীন রহিয়াছে, ফলে অন্তরে উহা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

স্বভাব অনুসারে মানুষের শ্রেণীবিভাগ— স্বভাব অনুসারে মানুষকে চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। **প্রথম**—স্বচ্ছ অন্তরবিশিষ্ট লোক অর্থাৎ এখন পর্যন্ত যাহার অন্তরে ভাল বা মন্দের কোন প্রভাব বা ছায়া পতিত হয় নাই এবং যেভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেইভাবেই রহিয়াছে। কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ কিছুই বুঝে নাই এবং সৎ বা অসৎ কোন কার্যেরই অভ্যাস হয় নাই। এরূপ স্বচ্ছ অন্তর দেখাদেখি বা সংসর্গক্রমে পারিপার্শ্বিকতার আচরণ ও ছায়া অতি তাড়াতাড়ি গ্রহণ করিতে পারে। সে যাহা দেখে বা শুনে তাহা অতি শীঘ্র তাহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়। তাহার জন্য একজন উপযুক্ত সুশিক্ষকের প্রয়োজন যিনি তাহাকে তা'লীম দিবেন, অসৎ স্বভাবের আপদসমূহ তাহার নিকট বর্ণনা করিবেন। মানব সন্তানের হৃদয় শৈশবকালে এরূপ স্বচ্ছই থাকে। তৎপর মাতাপিতা ও পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করত তাহাদের অন্তরে সংসারাসক্তি জন্মাইয়া তাহাদিগকে সেই প্রবৃত্তির উপর স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দেয়। ফলে তাহারা যদৃচ্ছভাবে জীবনযাপন করিতে থাকে। সন্তানাদির ধর্মরক্ষার দায়িত্ব পিতামাতার উপর অর্পিত হইয়াছে। এইজন্যই আল্লাহ্ বলেন ঃ قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিজকে এবং তোমাদের পরিজনবর্গকে দোযখের অগ্নি হইতে বাঁচাও।" **দ্বিতীয়**— যাহার অন্তরে এখন পর্যন্ত ভ্রমাত্মক বিশ্বাস স্থান লাভ করে নাই, কিন্তু দীর্ঘকাল ক্রোধ ও লোভের আজ্ঞাবহ থাকার দরুন উহা তাহার অন্তরে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহার উপর অবাধ প্রভুত্ব চালাইতেছে। ইহা সত্ত্বেও সে বেশ বুঝিতে পারে যে, সে যাহা করিতেছে, তাহা ভাল নহে। এরূপ লোককে পুনরায় সুপথে আনয়ন করা কঠিন হইলেও অসাধ্য নহে। তাহাকে সুপথে ফিরাইয়া আনিতে হইলে দুইটি পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। যথা– (১) কুঅভ্যাসগুলি একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। (২) আত্মসংশোধনের বীজ অন্তরে বপন করিতে হইবে। আত্মসংশোধনের আগ্রহ ও চেষ্টা নিজ হইতেই হৃদয়ে জন্মিলে তাড়াতাড়ি খারাপ অভ্যাস পরিত্যাগ করত সৎপথে প্রত্যাবর্তন সহজসাধ্য হইবে। **তৃতীয়**— যে ব্যক্তি অহরহ কুকর্ম করে ও যাহার অন্তরে এই অভ্যাস বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে; এই সমস্ত কর্ম করা যে অন্যায় ইহা সে উপলব্ধিই করিতে পারে না

এবং তাহার দৃষ্টিতে মন্দকার্য ভাল বলিয়া মনে হয়। এই শ্রেণীর লোক অতি অল্পই সুপথে ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হয়। **চতুর্থ**— যে ব্যক্তি মন্দকার্যকে উত্তম মনে করিয়া অহরহ করিতে থাকে এবং মন্দকার্য করিয়া আত্মগৌরবে বাহাদুরী প্রদর্শন করে; যথা– আমি এতগুলি লোককে হত্যা করিয়াছি; এত পরিমাণ মদ্য পান করিয়াছি ইত্যাদি। এই শ্রেণীর লোক অতি কঠিন রোগে আক্রান্ত, ইহার কোন প্রতিকার নাই। একমাত্র অপার করুণাময় আল্লাহ্‌র অযাচিত রহমত তাহার উপর বর্ষিত হইলে সে সুপথে ফিরিয়া আসিতে পারে, অন্যথায় নয়।

কুস্বভাবের প্রতিষেধক— কু-প্রবৃত্তিরূপ ব্যাধির একটিমাত্র মহৌষধ রহিয়াছে এবং কেহ এই মারাত্মক ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করিতে চাহিলে, তাহাকে এই ঔষধই সেবন করিতে হইবে। কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করাই এই মহৌষধ। কু-প্রবৃত্তি যাহা চায় তাহার বিপরীত কার্য না করিলে ইহাকে বিনাশ করা যায় না। প্রত্যেক পদার্থই ইহার বিপরীত পদার্থকে ধ্বংস করে। উষ্ণতার প্রভাবে রোগ জন্মে, ঠান্ডা দ্রব্য ব্যবহারে ইহার উপশম হয়। সেইরূপ ক্রোধের প্রভাবে যে কুস্বভাব উৎপন্ন হয়, সহিষ্ণুতায় ইহার বিরাম হয়। অহঙ্কারের প্রাধান্যহেতু যে মন্দ স্বভাব উৎপন্ন হয়, নম্রতাই ইহার একমাত্র ঔষধ। কৃপণতা হইতে যে হীন ও জঘন্য স্বভাব জন্মে, দীন দরিদ্রদিগকে দান ও অন্যান্য সৎকার্যে ধন ব্যয় করিলে ইহা নিবৃত্ত হয়।

উহা ছাড়া অন্যান্য সমস্ত বিষয়েও এই একই ব্যবস্থা প্রযোজ্য। সৎকার্য করিতে করিতে ইহার অভ্যাস যাহার হইয়া গিয়াছে, দেখা যায় যে, তাহার স্বভাব ততই উৎকৃষ্ট হইয়া উঠে। এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই শরীয়তে সৎকার্যের আদেশ প্রদান করা হইয়াছে। মানব-হৃদয়ে সদ্‌গুণ যোগ করিয়া দেওয়া এবং ইহার প্রতি তাহাকে উন্মুখ করিয়া তোলাই শরীয়তের লক্ষ্য।

অভ্যাস মানবের দ্বিতীয় স্বভাব—মানুষ চেষ্টা করিয়া যেরূপ অভ্যাস করে, তাহাই বদ্ধমূল হইয়া তাহার স্বভাবগত হইয়া পড়ে। সেইজন্যই অভ্যাসকে মানবের দ্বিতীয় স্বভাব বলে। অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, শৈশবকালে বালক-বালিকাগণ বিদ্যালয়ে গমন ও বিদ্যাভ্যাস করিতে চাহে না। কিন্তু বিদ্যালয়ে যাইতে তাহাদিগকে বাধ্য করিলে এবং বল প্রয়োগে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলে পরে ইহাই তাহাদের স্বভাবে পরিণত হয়। ক্রমে ক্রমে তাহারা বিদ্যার সুস্বাদ অধিক পরিমাণে ভোগ করিতে থাকে এবং আর কখনও বিদ্যাচর্চা হইতে বিরত থাকিতে পারে না।

আরও দেখ, যে ব্যক্তি কবুতর উড়ানো, দাবা, জুয়া বা অন্য কোন প্রকার খেলাধুলায় অভ্যস্ত হয়, উহাই তাহার স্বভাবগত হইয়া যায়। তখন সে এই কার্যে এত মত্ত হইয়া পড়ে যে, জীবনের যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ধন-দৌলত ইহাতেই বিনাশ করিয়া ফেলে, কিন্তু তবুও ইহা পরিত্যাগ করিতে পারে না। এমন কাজ অনেক আছে যাহা প্রথমত স্বভাববিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সর্বদা সেই কাজ করিতে থাকিলে বিরুদ্ধভাব বিদূরিত হইয়া অবশেষে ইহাই স্বভাবে পরিণত হইয়া পড়ে।

অভ্যাসে স্বভাবের বিকৃতি— চৌর্যবৃত্তিকে সকলেই অবজ্ঞা করিয়া থাকে। কিন্তু চুরি কার্যে কেহ অভ্যস্ত হইয়া গেলে ইহাই তাহার নিকট প্রিয় হইয়া উঠে। এমন নিপুণ চোরও আছে যে চৌর্যবৃত্তির শাস্তিস্বরূপ বেত্রাঘাত বা হস্তকর্তনের দুঃসহ যাতনা ভোগ করিয়াও নিজের বাহাদুরী প্রকাশ করিতে থাকে। নপুংসক লোকেরা হীন অপকর্ম করিয়া একজন অপরজন অপেক্ষা নিজের জঘন্য কার্যের জন্য গৌরব করিয়া থাকে। সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, আলিম, আমীর-ওমরা ও বাদশাহগণ যেরূপ উৎকৃষ্ট কার্যে গৌরব অনুভব করিয়া থাকেন, নিকৃষ্ট ব্যক্তিগণ ঠিক সেইরূপ অপকর্মে তাহাদের দক্ষতা ও পটুতার বাহাদুরী করিয়া থাকে। দীর্ঘকালের অভ্যাসের দরুনই এইরূপ হইয়া যায়।

আরও অনুধাবন কর, মানুষ মাটি খায় না; ইহা তাহার স্বভাববিরুদ্ধ। কিন্তু কোন ব্যক্তি মাটি খাইবার অভ্যাস করিলে ক্রমে তাহার এই অবস্থা হয় যে, মাটি না পাইলে সে অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। মৃত্তিকা ভক্ষণে কঠিন পীড়ার সম্ভাবনা থাকিলেও সে ইহা হইতে বিরত হয় না। মৃত্তিকা ভক্ষণের মত মানবস্বভাববিরুদ্ধ কার্য অভ্যাসের ফলে তাহার স্বভাবে পরিণত হইয়া যায়। এমতাবস্থায়, যাহা তাহার স্বভাব অনুযায়ী এবং তাহার জন্য পানাহারতুল্য তাহা নিয়মিতরূপে অহরহ অভ্যাস করিলে কেন ইহা মানবস্বভাবে পরিণত হইবে না?

কুপথ্যে লালসা পীড়ার লক্ষণ– হৃদয় ও দেহ উভয়ের জন্যই এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য। আল্লাহ্‌র মা'রিফাত অর্থাৎ তাঁহার পরিচয়লাভ ও তাঁহার আনুগত্য স্বীকার, ক্রোধ ও লোভকে আজ্ঞাধীন রাখা ইত্যাদি বৃত্তিসমূহ মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম। ফেরেশ্‌তাদের স্বভাবেও এইগুলি রহিয়াছে। এই সুপ্রবৃত্তিগুলিই হৃদয়ের খাদ্য। এই সমস্ত নিয়মিতরূপে বিকশিত ও স্ফূর্ত হইলেই মানব-হৃদয়ের শক্তি বৃদ্ধি পায়। কখন কখনও এই স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহের উলটা দিকেও মানব হৃদয়ের অনুরাগ ও আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়। হৃদয়ের ব্যাধি হইতেই এই বিরুদ্ধ ভাব-প্রবণতা জন্মিয়া থাকে। শারীরিক ব্যাধি হইলে যেমন মানবের স্বাভাবিক পানাহারে রুচি থাকে না, বরং ধ্বংসকারী কুপথ্যের দিকে লালসা ও মনের টান বৃদ্ধি পায়; হৃদয়ের ব্যাধি হইলেও ঠিক তদ্রূপ হইয়া থাকে। হৃদয় পীড়িত হইলেও কল্যাণকর সুপথ্য পরিত্যাগ করিয়া ধ্বংসকারী কুপথ্য ভোজনে মন অধিক লালায়িত হইয়া উঠে।

আল্লাহ্‌র মা'রিফাত লাভ ও তাঁহার আদেশ পালনে বিরত হইয়া মানব মন যখন অন্যান্য বিষয়ের দিকে অনুরক্ত হইয়া পড়ে, তখন মনে করিবে যে হৃদয় পীড়িত হইয়াছে। এই মারাত্মক ব্যাধির কথাই পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ্ বলিতেছেন– فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ অর্থাৎ 'তাহাদের অন্তঃকরণসমূহে ভীষণ ব্যাধি রহিয়াছে।" إِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ অর্থাৎ 'তবে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকটে নির্মল ও সুস্থ হৃদয় উপস্থিত করিবে" (সূরা– শুআরা, রুকু ৫)।

দৈহিক ব্যাধি যেমন ইহলৌকিক জীবনে ধ্বংস ও দুর্দশা আনয়ন করে, হৃদয়ের ব্যাধিও তদ্রূপ পারলৌকিক জীবনে বিনাশ ও দুর্দশা আনয়ন করে। চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে তিক্ত ও বিস্বাদ ঔষধ সেবন না করিলে যেমন শারীরিক ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া সুস্থ হওয়া যায় না, তদ্রূপ কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া শরীয়তের নির্দেশ অনুসারে না চলিলেও হৃদয়ের ব্যাধি দূর করিয়া সুস্থ হৃদয় লাভ করা যায় না।

আন্তরিক ব্যাধির ঔষধ ও প্রয়োগ-বিধি– মোটের উপর, শারীরিক ও আন্তরিক ব্যাধির ঔষধের প্রয়োগ-বিধি একই রকম। উষ্ণতার প্রভাবে যে ব্যাধি উৎপন্ন হয় ইহাতে ঠাণ্ডা ঔষধ এবং ঠাণ্ডার প্রভাবে যে ব্যাধি উৎপন্ন হয় ইহাতে উষ্ণ ঔষধ প্রয়োগে সুফল লাভ করা যায়। যাহার হৃদয় অহমিকা ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছে, সে যদি কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বল প্রয়োগে নম্রতা ও হীনতা অবলম্বন করে, তবে সে এই ব্যাধি হইতে মুক্তি পাইতে পারে। আবার কাহারও হৃদয়ে নম্রতা সীমা অতিক্রমপূর্বক অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তাহাকে হীনতার কূপে নিমগ্ন করিবার উপক্রম করিলে গর্ব ও অহমিকাবৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়া দিলেই এই ব্যাধির উপশম হইবে।

সৎস্বভাব অর্জনের উপায়— সৎস্বভাব অর্জনের তিনটি উপায় আছে।

প্রথম উপায়— জন্মগতভাবে প্রাপ্ত আল্লাহ্ প্রদত্ত স্বাভাবিক উপায়। পরম করুণাময় আল্লাহ্ অনুগ্রহপূর্বক মানব সৃজনের সময়েই সৎস্বভাবের মূলগুলি তাহার অন্তরে রোপণ করিয়া দিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যাঁহারা শিষ্টাচারে অত্যন্ত উন্নত বা খুব উচ্চ শ্রেণীর দাতা তাঁহারা এই সমস্ত মহৎবৃত্তি লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই স্বাভাবিক কারণের অস্তিত্ব অধিকাংশ স্থানে উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

দ্বিতীয় উপায়— যত্ন ও পরিশ্রমসাধ্য উপায়। কুপ্রবৃত্তির সহিত লড়াই করিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত নিজেকে সর্বদা সৎকর্মে নিযুক্ত রাখিলে ক্রমশ সৎকর্মের অভ্যাস হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া পড়ে।

তৃতীয় উপায়— সৎসংসর্গ। সৎস্বভাবী ব্যক্তির সংসর্গে থাকিলে অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের সদ্‌গুণ স্বতঃই অন্তরে প্রবেশ লাভ করে।

স্বভাবের তারতম্য হওয়ার কারণ— যে ব্যক্তি সৌভাগ্যক্রমে সৎস্বভাবের এই তিনটি উপায়ই লাভ করিয়াছেন, তিনি পূর্ণমাত্রায় সৎস্বভাব অর্জন করিবার সুবিধা পাইয়াছেন অর্থাৎ যাঁহার হৃদয়ে সৃষ্টির সময়েই সৎস্বভাবের মূলসমূহ রোপণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যিনি সৎসংসর্গের সুযোগ লাভ করিয়াছেন এবং নিজেও চেষ্টা ও যত্নের সহিত সৎকর্মে অভ্যস্ত হইতে পারিয়াছেন, তিনি পরম সৌভাগ্য লাভের অধিকারী হইয়াছেন।

অপরপক্ষে, যে ব্যক্তি এই তিনটি উপায় হইতেই বঞ্চিত রহিয়াছে অর্থাৎ সৃষ্টির সময়ে কুস্বভাবের মূলসমূহ অন্তরে লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অসৎলোকের সংসর্গে জীবন অতিবাহিত করিতেছে এবং নিজেও অসৎকর্মে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার স্বভাবও পূর্ণতা লাভ করে, তবে ইহা খারাপের দিকে পূর্ণতা।

মানবস্বভাবের উল্লিখিত দুইটি প্রান্ত আছে, একটি মন্দের দিকে শেষ প্রান্ত এবং অপরটি সুন্দরের দিকে শেষ প্রান্ত। দুই প্রান্তের মধ্যে অসংখ্য দরজা বা সোপান আছে। সৎস্বভাব অর্জনের পূর্ববর্ণিত ত্রিবিধ উপায়ের তারতম্য অনুসারে মানুষ সেই সমস্ত সোপানের কোন না কোন সোপানে অবস্থান করে। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে ঐ উপায়সমূহের একাংশ বা অধিকাংশ লাভে সমর্থ হয়, তাহার স্বভাবও সেই পরিমাণে সুন্দর বা কদর্য হইয়া থাকে। এইজন্যই পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ط وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ -

অর্থাৎ "অনন্তর যে ব্যক্তি রেণু পরিমাণ সৎকার্য করিবে, সে উহা দেখিতে পাইবে; আর যে ব্যক্তি রেণু পরিমাণ মন্দ কার্য করিবে, সে উহা দেখিতে পাইবে।"

আত্মার পাপ-পুণ্যের ফলভোগ—বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা মানুষ সকল কাজ করিয়া থাকিলেও উহার সহিত মন সঞ্চালিত করিবার আবশ্যকতা রহিয়াছে। বাহিরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে মনের মিলন না ঘটিলে কোন কাজই সম্পন্ন হইতে পারে না। সুতরাং সকল কাজের ফল অন্তরে যাইয়া সঞ্চিত হয় ও অন্তরই এই সমস্ত কাজের ফল ভোগ করিয়া থাকে। আত্মাকেই পরকালের সফর করিতে হইবে এবং তাহাকেই আল্লাহ্র সমীপে উপস্থিত হইতে হইবে। অতএব আত্মাকে নিষ্কলঙ্ক সৌন্দর্যের আধার ও পূর্ণমাত্রায় গুণবান করিয়া তুলিতে হইবে, যেন ইহা আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হওয়ার উপযুক্ত হইয়া উঠে। তজ্জন্য আত্মাকে মুকুরের ন্যায় সরল, নির্মল ও স্বচ্ছ করিয়া তোলা আবশ্যক। তাহা হইলে আলমে মালাকুতের অর্থাৎ অদৃশ্য জগতের ছায়া ইহাতে সুন্দররূপে প্রতিফলিত হইতে পারে।

আত্মা এই অবস্থায় উন্নীত হইলে এমন অপার সৌন্দর্য নয়নগোচর হইতে থাকিবে এবং এরূপ পরম আনন্দ উভোগে আসিবে যে, উহার তুলনায় বেহেশ্তও তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে। পরকালের সুখ ও আনন্দ জড়দেহ কিছুট ভোগ করিবে সত্য, কিন্তু একমাত্র আত্মাই ইহার স্বাদ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিবে। দেহ আত্মারই আজ্ঞাবহ।

পাপ-পুণ্যের গূঢ়তত্ত্ব—দেহ ও আত্মা একই শ্রেণীর পদার্থ নহে। কারণ, আত্মা আধ্যাত্মিক জগতের পদার্থ এবং দেহ জড় জগতের অন্তর্ভুক্ত। দর্শন পুস্তকে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। দেহ আত্মা হইতে পৃথক হইলেও দেহের সঙ্গে আত্মার এক রহস্যপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান রহিয়াছে। দেহ দ্বারা কোন সৎকাজ সম্পন্ন হইলে ইহার ফলে দেলে একটি নূর বা জ্যোতি উৎপন্ন হয় এবং তদ্বারা দেল জ্যোতির্ময় ও সুশোভিত হইয়া উঠে। অপরপক্ষে, দেহ দ্বারা কোন কুকর্ম সম্পন্ন হইলে এক প্রকার অন্ধকার উৎপন্ন হইয়া দেলকে আবৃত করিয়া ফেলে। পূর্বোক্ত নূরকেই পুণ্য কহে এবং ইহাই সৌভাগ্যের মূল। আর শেষোক্ত অন্ধকারকেই পাপ বলে এবং ইহাই দুর্ভাগ্যের অঙ্কুর।

উৎকৃষ্ট গুণাবলী অর্জনই মানবজীবনের লক্ষ্য—দেহ ও আত্মার মধ্যে উক্ত প্রকার সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়াই মানবকে এই জড়জগতে আনয়ন করা হইয়াছে, যেন আত্মা দেহকে নিয়োজিত করিয়া জীবনের চরম ও পরম সৌভাগ্যের বীজগুলি সঞ্চয় করিয়া লইতে পারে। এই উৎকৃষ্ট গুণাবলি অর্জনে মানুষ তাহার দেহকে ফাঁদ বা যন্ত্রের ন্যায় ব্যবহার করিবে।

আত্মার উপর কার্যের প্রভাব—লেখা কাজটি আসলে আত্মারই কাজ, যদিও অঙ্গুলি দ্বারাই লেখন কার্যটি সম্পন্ন হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি সুন্দর হরফে লিখিতে চাহিলে সর্বপ্রথম বিশেষ যত্নে সুন্দর হস্তাক্ষরের আকৃতি অঙ্কন করিতে বারবার চেষ্টা করিতে হয়। কিছুকাল এরূপ করিতে থাকিলে সুন্দর অক্ষরের আকৃতিগুলি হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়া যায়। ইহার পর তৎসমুদয়ের প্রতি আন্তরিক দৃষ্টি রাখিয়া সেই আঙ্গুলের সাহায্যে হৃদয়স্থিত অক্ষরগুলি কাগজের উপর অঙ্কিত করিয়া দিলেই লিখন কার্যটি সুসম্পন্ন হয়।

সেইরূপ মানব হস্তপদাদি বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে সৎকার্য করিতে থাকিলে হৃদয়ফলকে ইহার সাধু চিত্র অঙ্কিত হইতে থাকে। কিছুদিন ক্রমাগত সৎকার্যাদি করিতে থাকিলে এই চিত্রটি হৃদয়ে একটি সুদৃঢ় স্থায়ীভাবে পরিণত হইয়া যায়। মানব এই অবস্থাপ্রাপ্ত হইলে সৎকার্যাবলী তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত সাধু ছবিগুলি অনুরূপভাবে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। সুতরাং প্রমাণিত হইল যে, বিশেষ পরিশ্রম সহকারে নিজেকে সৎকার্যে প্রবৃত্ত করিয়া লওয়াই সমস্ত সৌভাগ্যের সূচনা। এইরূপে নিজেকে জোর-জবরদস্তি সৎকার্যে নিয়োজিত করিলে এবং পূনঃ পূনঃ সৎকার্যের অনুষ্ঠান সর্বদা করিতে থাকিলে এই সৎ অভ্যাস হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়। তখন ইহার নূরও হৃদয় হইতে বাহিরের দিকে বিচ্ছুরিত হইতে আরম্ভ করে এবং ইতঃপূর্বে যে কার্য জোর-জবরদস্তি ও বিশেষ পরিশ্রম সহকারে করিতে হইত তাহা এখন স্বাভাবিক আগ্রহ ও আনন্দের সহিত হইতে থাকে। দেহ ও দেলের মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে অর্থাৎ দেহ স্বীয় কার্যের প্রভাব দেলে প্রতিফলিত করিতে পারে, এবং দেলও আপন ভাবের আলোক বা অন্ধকার দেহের উপর বিস্তার করিতে পারে, এই কারণেই উক্ত বিস্ময়কর ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে। এইজন্য আনমনা হইয়া কোন কার্য করিলে ইহার প্রতিফল নিতান্ত নগণ্য হইয়া যায়।

ঔষধের পরিমাণ নিরূপণ—ঠাণ্ডারোগে গরম ঔষধ প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যায়। এইজন্য ঠাণ্ডারোগে আক্রান্ত ব্যক্তি গরম দ্রব্য যত পাইবে ততই ভক্ষণ করিবে, ইহা কিছুতেই সঙ্গত নহে। ইহা করিলে ঠাণ্ডা দূর হইয়া অত্যধিক গরমের দরুণ আবার অপর একটি নূতন রোগ দেখা দিতে পারে। তাই ঔষধ প্রয়োগেরও একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। ঔষধ সেবনকালে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন ইহাতে গরমও না আসে এবং ঠাণ্ডাও না আসে বরং স্বভাবে এই সুন্দর সাম্যভাব স্থাপিত হয়। ইহাই চিকিৎসার উদ্দেশ্য। প্রকৃতি সাম্যভাবপ্রাপ্ত হইলে ঔষধ সেবন ছাড়িয়া দিয়া এই সাম্যভাব রক্ষার্থে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। প্রকৃতি যাহাতে আবার ঠাণ্ডা বা গরম না হইয়া যায়, এইরূপ আহার্য্য ভক্ষণ করা উচিত।

দৈহিক প্রকৃতির দুইটি প্রান্ত আছে—একটি শীতল, অপরটি উষ্ণ। এই দুই প্রান্তের উভয়টিই মন্দ। এই দুই প্রান্তকে দুই পার্শ্বে রাখিলে ঠিক মাঝখানে একটি নাতিশীতোষ্ণ মধ্যস্থান বা মধ্যপথ রহিয়াছে। হৃদয়ের স্বভাবের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। ইহারও দুইটি প্রান্ত ও একটি মধ্যপথ আছে। এই মধ্যপথ অবলম্বন করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

উদাহরণস্বরূপ, আমরা ধন দান করিবার জন্য কৃপণকে আদেশ দিয়া থাকি। কিন্তু এই দানেরও একটা সীমা আছে। যে পর্যন্ত দান করা তাহার পক্ষে সহজ ও কোন কষ্টের কারণ না হয়, সেই পর্যন্ত দান করাই তাহার পক্ষে উচিত, নিজের যথাসর্বস্ব দান করিয়া পরের ভারস্বরূপ এবং অপচয়ের অপরাধে অপরাধী হওয়া উচিত নয়। চিকিৎসাশাস্ত্র যেরূপ দৈহিক রোগে ঔষধের মাত্রা ঠিক করিয়া দিয়াছে। যে পরিমাণ দান করিবার আদেশ শরীয়তে রহিয়াছে, হৃষ্টচিত্তে সেই পরিমাণ দানে মানুষের অভ্যস্ত হওয়া উচিত এবং ইহার বিরুদ্ধাচরণে কৃপণতা করা কিছুতেই তাহার পক্ষে সঙ্গত নহে। তদ্রূপ যাহা খরচ করিতে শরীয়ত নিষেধ করিয়াছে, তাহার ব্যয় করিবার কল্পনাও হৃদয়ে স্থান দেওয়া সঙ্গত নহে। এইরূপে শরীয়তের আদেশ-নিষেধ অনুসরণ করিলেই অন্তরের সাম্যভাব রক্ষিত হইবে।

শরীয়তের আদেশ-নিষেধ অনুসারে চলিতে যাহাদের হৃদয়ে আগ্রহ ও আসক্তি নাই, বরং অনেক চেষ্টা চরিত্র করিয়া নিজকে ধরিয়া বাঁধিয়া শরীয়তের আদেশ পালন করিতে হয়, মনে করিতে হইবে যে, তাহাদের হৃদয় রোগাক্রান্ত। কিন্তু তাহাদের রোগ তত মারাত্মক ও জঘন্য নয়। জোরজবরদস্তি কায়ক্লেশে শরীয়তের আদেশ পালন করিতে থাকিলেই এই রোগে আরাম হইবে এবং পরিশেষে উহাই তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল ও স্বভাবগত হইয়া যাইবে। এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই রাসূলে মাকবূল (সা) বলেন, "মনের খুশী ও আনন্দের সহিত আল্লাহ্‌র আদেশ পালন কর। তাহা যদি না পার তবে বল প্রয়োগে কষ্টে-সৃষ্টেই ইহা পালন কর। এইভাবে পালন করিলেও বহু সওয়াব পাইবে।"

যে ব্যক্তি অনিচ্ছায় কষ্টে-সৃষ্টে দান করে তাহাকে দাতা বলে না। যে ব্যক্তি মনের খুশী ও আনন্দে, সহজ ও সরলভাবে দান করে তাহাকেই দাতা বলে। কিন্তু যে ব্যক্তি বহু চেষ্টা ও যত্নে স্বীয় ধনের হেফাযত করে এবং অপচয় করে না, তাহাকে কৃপণ বলা চলে না। বরং ধন জমাইয়া রাখাই যাহার প্রকৃতিগত হইয়া গিয়াছে এবং কিছু ব্যয় করিতে চাহিলেই প্রবৃত্তি তাহাকে বাধা প্রদান করে, ফলে সে পরাজিত হইয়া আর ব্যয় করে না, তাহাকে কৃপণ বলা হইয়া থাকে।

শরীয়তের নির্দেশ পালনে সন্তোষ আবশ্যক— মোটের উপর, শরীয়তের নির্দেশ পালন যেন মানুষের জন্য সহজ সরল হইয়া যায় এবং বলপ্রয়োগে কষ্টে-সৃষ্টে যেন নির্দেশ পালন করিতে না হয়, মানুষের স্বভাব এইরূপ হইয়া যাওয়া উচিত। যে ব্যক্তি তাহার পরিচালন ভার শরীয়তের উপর ছাড়িয়া দিয়াছে এবং বিনা দ্বিধায় ও

সন্দেহে কোন প্রকার বাদানুবাদ না করিয়া মনের আনন্দে সহজ সরলভাবে শরীয়তের নির্দেশ পালন করিয়া চলে, সেই ব্যক্তিই এইরূপ সৎস্বভাব অর্জন করিয়াছে বলিতে হইবে। এইদিকে লক্ষ্য করিয়াই আল্লাহ্ রাসূলে মাক্‌বূল (সা)-কে সম্বোধন করিয়া বলেন ঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ

অর্থাৎ "অনন্তর আপনার প্রতিপালকের শপথ ইহারা মু'মিন হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ইহা না হইবে যে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যে ঝগড়া সংঘটিত হয় উহাতে তাহারা আপনার দ্বারা মীমাংসা করাইবে। অনন্তর আপনার এই মীমাংসায় নিজেদের অন্তরে সঙ্কীর্ণতাবোধ না করে এবং পুরাপুরিভাবে সমর্থন করিয়া লয়" (সূরা নিসা, রুকু-৯)।

এই আয়াতে একটি নিগূঢ় তত্ত্ব রহিয়াছে এবং এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্ভবপর নহে, তাই অতি সংক্ষেপে সামান্য ইঙ্গিত করা যাইতেছে। ফেরেশতার গুণাবলী অর্জন করাই মানবের পরম সৌভাগ্যের বিষয়, কেননা গুণ ও ধর্ম সম্বন্ধে মানুষ ও ফেরেশতার মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে। আলমে মালায়িকাহ্ অর্থাৎ ঊর্ধ্ব আধ্যাত্মিক জগত তাহাদের উভয়েরই উৎপত্তিস্থল। আলমে মালায়িকাহ্ হইতে মুসাফিরের ন্যায় মানুষ এই জড় জগতে আগমন করিয়াছে। সংসারে অবস্থানের দরুন মানুষ সংসারের কতিপয় গুণ সঙ্গে লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবে। এই গুণরাজি ফেরেশতার গুণ হইতে বিভিন্ন হইবে বলিয়া মানুষকে ফেরেশতা শ্রেণী হইতে পৃথক থাকিতে হইবে। তাই মানুষকে যখন আলমে মালায়িকাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেই হইবে তখন নবার্জিত গুণগুলি বর্জন করত ফেরেশতাদের গুণ লইয়াই সেই দেশে যাত্রা করা উচিত। এই জড় জগতে অর্জিত কোন বিজাতীয় গুণ সাথে লইয়া যাওয়া কিছুতেই উচিত নহে।

এই জগতে ধন-সম্পদ জমাইবার বাসনা যাহার প্রবল, ধন-সম্পদের প্রতিই সে আসক্ত। আবার যে ব্যক্তি অতিরিক্ত ধন সম্পদ খরচ করিতে লালায়িত সেও ধন সম্পদের প্রতিই অনুরক্ত, আর যে ব্যক্তি স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও অহঙ্কার প্রকাশে আগ্রহান্বিত সেও সাংসারিক ব্যাপারে লোকদের প্রতি আশ্বস্থ না হইয়া পারে না। ফেরেশতাগণ কিন্তু না ধন-সম্পদের প্রতি অনুরক্ত, না লোকদের প্রতি আসক্ত। আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর প্রতিই তাঁহারা দৃষ্টিপাত করেন না। মানবেরও তদ্রূপ ধন-সম্পদ এবং লোকদের প্রতি আসক্তি ছিন্ন করিয়া ফেলা উচিত।

দুনিয়া বর্জনে মধ্যপন্থা—ধন-সম্পত্তি ও যশ-প্রতিপত্তির আসক্তি ছিন্ন করিয়া ফেলিলে মন পাক-পবিত্র হইতে পারে। কিন্তু এই জড় জগতে জীবন ধারণের জন্য স্বাভাবিক ক্ষুৎপিপাসা ইত্যাদি যে সকল চিন্তা হইতে মানবমন একেবারে মুক্ত হইতে

পারে না তৎসমুদয় মধ্যপথ গ্রহণ করা উচিত। তাহা হইলে মনের উপর উহাদের কোন প্রভাব আছে বলিয়াই মনে হইবে না। উপমাস্বরূপ, পানি কখনও শীতাতপ হইতে সম্পূর্ণ শূন্য হইতে পারে না। কিন্তু মধ্যমাবস্থা প্রাপ্ত হইলে ইহাকে শীতাতপশূন্য বলিয়া মনে হয়। মানব প্রবৃত্তি সম্পর্কে যে মধ্যপথ গ্রহণের নির্দেশ রহিয়াছে ইহাই তাহার তাৎপর্য। অতএব দুনিয়ার সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া মানবমন যেন কেবল আল্লাহ্‌তে নিমজ্জিত থাকিতে পারে তৎপ্রতি মানুষের যত্নবান হওয়া আবশ্যক। এইজন্যই আল্লাহ্ আদেশ করিয়াছেন قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ অর্থাৎ "বল, আল্লাহ্, অনন্তর আর সমস্ত পরিত্যাগ কর।" এই পবিত্র আয়াতে কলেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর হাকীকত বর্ণিত হইয়াছে। যাহা হউক, যাবতীয় দোষ-ত্রুটি ও মলিনতা হইতে সম্পূর্ণরূপে পাক-পবিত্র হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নহে। তাই আল্লাহ্ বলিতেছেন ঃ

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا -

অর্থাৎ "হে মানব, এমন তোমাদের মধ্যে কেহই নাই, যে ব্যক্তি সেই অবস্থার উপর দিয়া না গিয়াছে, এই বিধান তোমার প্রভু দৃঢ়ভাবে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন" (সূরা মরিয়ম, রুকু ৫, পারা ১৬)।

তাওহীদের মরতবা অর্জন রিয়াযতের লক্ষ্য—উল্লিখিত বর্ণনা হইতে মোটামুটি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছ যে, রিয়াযত বা চরিত্র সংশোধনের জন্য যে সমস্ত চেষ্টা-তদবীর, পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, উহার একমাত্র লক্ষ্য তাওহীদ বা একত্ব বিশ্বাসের মরতবা লাভ করা। একমাত্র তাওহীদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পথ চলিতে চলিতে এমন এক অবস্থায় উপনীত হইবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুই তোমার দৃষ্টিগোচর হইবে না, একমাত্র তাঁহার ইবাদতেই মশগুল থাকিবে এবং তাহা ব্যতীত অন্য কাহারও আকাঙ্ক্ষা তোমার হৃদয়ে থাকিবে না। এইরূপ ভাবপ্রাপ্ত হইলেই সৎস্বভাবসমূহ মানুষের অর্জিত হয় এবং মানবীয় নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে উঠিয়া মানুষ হাকীকত অর্থাৎ যথার্থ অবস্থায় উন্নীত হইতে পারে।

চরিত্র সংশোধনের উপায়—চরিত্র সংশোধনের কার্যে অতি কঠোর সাধনা ও পরিশ্রম করিতে হয়। ইহা এত কঠিন ও দুঃসাধ্য যে, ইহাতে মৃত্যুযন্ত্রণার ন্যায় যাতনা রহিয়াছে। এতদ্‌সত্ত্বেও কামিল পীর বা সুনিপুণ অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শকের নির্দেশ অনুসারে চলিলে কাজটি অনায়াসসাধ্য হইয়া যায়। কামিল পীর প্রথমেই স্বীয় মুরীদকে আল্লাহ্‌র হাকীকতের দিকে আহ্বান করেন না, কারণ তখনও তাহার এই শিক্ষা গ্রহণের শক্তি অর্জিত হয় নাই।

উদাহরণস্বরূপ লক্ষ্য কর, শৈশবকালে বালক-বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবার সময় তাহাদিগকে প্রভুত্ব, প্রতিপত্তি বা রাজত্বের প্রলোভন দেখাইলে কোনই ফল হয় না; কারণ প্রভুত্ব, প্রতিপত্তি বা রাজত্ব যে কি পদার্থ তাহারা তখনও উপলব্ধি করে

নাই। তাহারা যাহার আস্বাদ লাভ করিয়াছে এবং যাহা বুঝে তাহার প্রলোভন দিলেই সুফল দর্শে। বরং শিশুদিগকে যদি বল, "বাপু, বিদ্যালয়ে গমন কর, পড়া শেষ হইলে শিক্ষক মহাশয় তোমাকে ডাণ্ডা-গুলী খেলিতে দিবেন এবং আমিও তোমাকে একটি শুক পাখি ক্রয় করিয়া দিব," তাহা হইলে এই প্রলোভনে শিশু অবশ্যই বিদ্যাভ্যাসের জন্য পাঠশালায় গমন করিবে।

শিশু আর একটু বয়স্ক হইলে তাহাদিগকে নানারূপ সুন্দর ও বিচিত্র বসন-ভূষণের প্রলোভন দেখাইলে উপকার হয় এবং তাহারা খেলতামাশা পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যাভ্যাসে মনোযোগী হয়। বালকের বয়স আরও বৃদ্ধি পাইলে যদি প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তির আশ্বাস দিয়া বল- "বাবা, সুন্দর বিচিত্র বসন-ভূষণে সুসজ্জিত হওয়া ত রমণীদের কাজ। কঠোর পরিশ্রম ও যত্নের সহিত বিদ্যা শিক্ষা কর, তাহা হইলে লোকে তোমাকে সম্মান ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবে, তোমাকে প্রভুত্ব দান করিবে এবং তুমি একজন বড়লোক হইয়া যাইবে," তবে উপকার পাইবে।

তাহার বয়স আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে বলিবে- "বাবা, এ জগতে প্রভুত্ব, প্রতিপত্তি বা বড়মানুষির কোনই মূল্য নাই। মৃত্যুর সাথে সাথে সমস্তই নিঃশেষ হইয়া যাইবে। সুতরাং পরকালের চিরস্থায়ী বাদশাহী লাভের জন্য বিদ্যা শিক্ষা কর।" এইরূপে প্রলোভন দিতে থাকিলে শৈশবকাল হইতেই অতিশয় আনন্দ ও আগ্রহের সহিত মানব বিদ্যাভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হয়। ধর্মপথের পথিকদিগকেও রিয়াযতকালে এই নিয়মানুসারে পরিচালনা করা আবশ্যক।

পীর যদি প্রাথমিক অবস্থায়ই মুরীদকে এক লাফে চরম ও পরম লক্ষ্যবস্তু আল্লাহ্‌কে ধরিবার নির্দেশ দান করেন তবে ইহা তাহার জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। প্রথম হইতেই একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য ইখলাস বা পূর্ণ বিশুদ্ধ সঙ্কল্পে কাজ করিয়া যাওয়া নিতান্ত দুরূহ ও দুঃসাধ্য বিষয়। তাই কামিল পীর স্বীয় মুরীদকে ধর্মপথে চলিবার অনুমতি প্রদান করিয়া বলেন, "হে শিষ্যবৃন্দ, তোমরা সৎস্বভাব অর্জনের জন্য কঠোর সাধনা ও পরিশ্রম করিতে থাক, তোমরা সৎ হইলে লোকে তোমাদের প্রশংসা করিবে।"

এইরূপে প্রশংসা লাভের দিকে আকৃষ্ট করিয়া মুরীদদের অন্তর হইতে অতিরিক্ত পানাহারের লিপ্সা ও ধনাসক্তি দমন করিতে হইবে। ইহাতে পানাহারের লোভ ও ধনাসক্তি দমন হইবে বটে, কিন্তু তৎপরিবর্তে গর্ব ও যশ-প্রতিপত্তির লালসা তাহাদের অন্তরে জন্মলাভ করিবে। কিন্তু পীর যখন দেখিবেন যে, মুরীদের অন্তর হইতে লিপ্সা ও ধনাসক্তি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে তখন তিনি তাহার যশ-প্রতিপত্তির লালসা ও প্রশংসা পাইবার লোভকে দমন করিতে চেষ্টা করিবেন। তজ্জন্য বাজারে ও প্রকাশ্য পথে ভিক্ষুকের বেশে বিচরণ করিবার নিমিত্ত মুরীদকে নির্দেশ দিতে হইবে। ইহাতে অন্তর হইতে যশোলিপ্সা, সম্মান-লালসা, মান-অভিমান চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে। তখন ভিক্ষুকবেশ পরিবর্তন করিয়া তাহাকে মেথররূপে পায়খানা পরিষ্কার ইত্যাদি নিকৃষ্ট ও

ঘৃণ্য কাজে নিয়োগ করিতে হইবে। এইরূপে ঘৃণ্য প্রবৃত্তিও তাহার হৃদয় হইতে চূর্ণ হইয়া যাইবে। এই নিয়মে পীর মুরীদের অন্তরে যখন যে প্রবৃত্তি প্রবল দেখিবে তখনই মাত্রা পরিমাণ ইহার ঔষধ প্রয়োগ করিবেন। একবারে সমস্ত কুপ্রবৃত্তি দমনের আদেশ দিলে ইহা মুরীদের পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিবে।

রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা দুর্দমনীয় রিপু—ভোজন-লালসা ও ধনাসক্তি তত বড় রিপু নহে। যশ ও প্রশংসা লাভের আশায় উহা পরিত্যাগ করিবার কষ্ট সহ্য করা চলে। কিন্তু উহার চেয়ে অত্যন্ত প্রবল রিপুও মানব অন্তরে বিদ্যমান আছে। ভোজন-লালসা, ধনাসক্তি ইত্যাদি রিপুসমূহকে সাপ-বিচ্ছুর সহিত তুলনা করিলে রিয়া বা সুখ্যাতি প্রিয়তা ও প্রদর্শনেচ্ছাকে নিঃসন্দেহে ভীষণ বিষধর অজগরের সহিত তুলনা করা চলে। সমস্ত রিপু দমন হইয়া গেলেও রিয়া রিপু মানব মনে দুর্দমনীয়রূপে থাকিয়া যায়। সকল রিপু চূর্ণ করিবার পরও ধর্মপরায়ণ লোকদিগকে রিয়া দমন করিতে অত্যন্ত কষ্ট করিতে হয়। আর এই রিপুকে দমন করিতে পারিলেই মানব ধর্মপথের সর্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে পারে।

আন্তরিক রোগ নির্ণয়ের উপায়—দেহ, হস্তপদ, চক্ষু ইত্যাদি সুস্থ আছে, না রোগাক্রান্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইলে দেখিতে হইবে, যে কাজের জন্য ঐ অঙ্গ সৃজন করা হইয়াছে, তদ্বারা তাহা অনায়াসে সুসম্পন্ন হইতেছে কিনা। অনায়াসে সম্পন্ন হইতেছে দেখিলেই মনে করিতে হইবে, উহা সুস্থ আছে। চক্ষু দিয়া যদি অনায়াসে সুন্দররূপে দর্শন করা যায়, কর্ণ দিয়া যদি অনায়াসে সুন্দররূপে শ্রবণ করা যায় তবেই মনে করিবে যে, ইহারা রোগাক্রান্ত হয় নাই। দেলকে যেভাবে ও যে কার্যের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা যদি ঠিক সেইভাবে থাকে ও ঐ কার্য তদ্বারা অনায়াসে সুসম্পন্ন হয় তবে মনে করিবে দেলও সুস্থ আছে। সৃজনেরকালে দেলের যে ভাব বা গুণ ছিল তাহা বিশুদ্ধ ও অবিকৃত থাকিলেই সে তাহার কাজ সহজে আনন্দের সহিত করিতে পারিবে।

অবিকৃত হৃদয়ের নিদর্শন—দুইটি নিদর্শন দ্বারা হৃদয়ের অবস্থা নির্ণয় করা চলে; প্রথম, ইরাদা বা বাসনা, দ্বিতীয়, কুদরত বা শক্তি। এস্থলে ইরাদা অর্থে আল্লাহ্‌কে তাহা ব্যতীত অন্যান্য সকল পদার্থ অপেক্ষা অধিক ভালবাসিবার বাসনাকে বুঝিতে হইবে। পানাহার যেমন শরীরের খাদ্য, মা'রিফাত অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পরিচয় জ্ঞান তদ্রূপ হৃদয়ের খাদ্য। যে ব্যক্তির পানাহারের বাসনা একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে বা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, মনে করিবে, তাহার শরীরে রোগ উৎপন্ন হইয়াছে। তদ্রূপ যে হৃদয় হইতে আল্লাহ্‌কে জানিবার ও তাঁহাকে ভালবাসিবার বাসনা বিলুপ্ত হইয়াছে বা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, মনে করিবে যে, সেই হৃদয়ও রোগাক্রান্ত হইয়াছে।

তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ الاية অর্থাৎ "(হে নবী, আপনি) বলুন, তোমাদের পিতৃগণ, ভ্রাতৃগণ, স্ত্রী সকল এবং তোমারে আত্মীয়গণ এবং ধন-সম্পত্তি যাহা (তোমরা) উপার্জন করিয়াছ এবং বাণিজ্য যাহার বন্ধ হওয়াকে ভয়

করিতেছ এবং যে ঘরগুলি পছন্দ করিতেছ, (এ সমুদয়) যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল এবং তাঁহার পক্ষে জিহাদ করা অপেক্ষা প্রিয়তর হয়, তবে ঐ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা কর যে, আল্লাহ্ নিজের হুকুম উপস্থিত করেন" (সূরা তওবা, রুকু ৩, পারা ১০)।

কুদরত অর্থে বুঝিতে হইবে যে, আল্লাহ্‌র আজ্ঞা পালনে যে শক্তি প্রয়োগ করিতে হয় তাহা যেন স্বাভাবিকভাবে ও অনায়াসে হইয়া যায় এবং প্রবৃত্তির উপর বলপ্রয়োগ করিয়া ধরিয়া বাঁধিয়া নিজের দ্বারা পালন করিয়া না লইতে হয় এবং আরাম ও আনন্দ, যওক-শওকের সহিত অনায়াসে ও স্বাভাবিকভাবে আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করে। তাহা হইলে ক্রমে আল্লাহ্‌র আদেশ পালনের আনন্দ এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে, ইহার সহিত আদেশ পালনের শক্তিও উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। এই দিকে লক্ষ্য করিয়াই রাসূলে মাক্‌বূল (সা) বলেন ঃ جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِىْ فِى الصَّلٰوةِ অর্থাৎ "নামাযকে আমার চোখের পুতলি করা হইয়াছে।" ইহার অর্থ এই যে, তিনি নামাযে অসীম আনন্দ লাভ করিতেন।

আল্লাহ্‌র আজ্ঞাবহ হওয়া মানবের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয়। কাজেই তাঁহার প্রতিটি আদেশ পালনে অসীম আনন্দ লাভ করা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু যে ব্যক্তি ইহাতে আনন্দ অনুভব করে না তাহার হৃদয় রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে আনন্দ না পাওয়াই হৃদয় পীড়িত হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ। মানুষ নিজের দোষ-ত্রুটি দেখিতে পায় না। সে স্বীয় পীড়া সম্বন্ধে অজ্ঞাত থাকিলেও তাহার হৃদয়ে রোগ জন্মিয়াছে ধরিয়া লইয়া তাহার চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

রোগ চিনিবার কৌশল—চারিটি উপায়ে আন্তরিক রোগ বা নিজের দোষ-ত্রুটি বুঝিতে পারা যায়।

প্রথম—কামিল পীরের সংসর্গে থাকিলে তিনি তাহার দোষ-ত্রুটি প্রদর্শন করিয়া তাহাকে সাবধান করিয়া দিতে পারেন; কিন্তু বর্তমান যমানায় এইরূপ কামিল পীর অতি বিরল। সুতরাং এই উপায়ের সুবিধা বর্তমানে নিতান্ত দুর্লভ।

দ্বিতীয়—কোন সদয় ধর্মবন্ধুকে নিজের দোষ-ত্রুটি পর্যবেক্ষণের জন্য নিয়োজিত করা। যে ব্যক্তি স্নেহের বশবর্তী হইয়া মিষ্টবচনে দোষ লুক্কায়িত করিবেন না, বা হিংসার বশবর্তী হইয়া নগণ্য দোষ অতিরঞ্জিত করিয়া বাড়াইয়া তুলিবেন না, এইরূপ আল্লাহ্ ভীরু লোককে নিজের দোষ পর্যবেক্ষকরূপে নিয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু এরূপ বন্ধুও বর্তমান যমানায় নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য। হযরত দাউদ তায়ীকে (র) কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল- "আপনি লোক সংসর্গে থাকেন না কেন?" তিনি উত্তরে বলিলেন- "যাহারা আমার নিকট হইতে আমার দোষ লুক্কায়িত করিবে, তাহাদের সংসর্গে থাকিয়া আমার কি লাভ।"

তৃতীয়—শত্রুগণ তোমার সম্বন্ধে যাহা বলে তাহা শ্রবণ কর। শত্রুগণ কেবল দোষই দেখিয়া থাকে। হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার বশবর্তী হইয়া তাহারা ক্ষুদ্র দোষকে

লোকের নিকট বড় করিয়া প্রকাশ করিবে বটে, কিন্তু তথাপি তাহাদের উক্তিতে কিছু সত্য অবশ্যই থাকিবে।

চতুর্থ—অন্যের দোষ-ত্রুটি দেখিয়া নিজের মধ্যে এইরূপ দোষ-ত্রুটি আছে কিনা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে এবং থাকিলে সযত্নে উহা পরিত্যাগ করিবে। আর এরূপ দোষ-ত্রুটি না থাকিলেও নিজকে নির্দোষ বলিয়া মনে করিবে না এবং সর্বদা সচেতন ও সতর্ক থাকিবে যেন এবং বিধ দোষ-ত্রুটি তোমাকে কখনও স্পর্শ করিতে না পারে। হযরত ঈসা (আ)-কে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল- "আপনি এত উত্তম শিষ্টাচার কাহার নিকট হইতে শিখিলেন?" তিনি বলিলেন- "কাহারও নিকট হইতে শিক্ষা করি নাই, তবে অপরের মধ্যে যে দোষ-ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াছি উহা তৎক্ষণাত সযত্নে বর্জন করিয়াছি।"

স্বীয় দোষ অনুসন্ধান আবশ্যক—যে ব্যক্তি অত্যন্ত নির্বোধ কেবল সেই নিজেকে দোষমুক্ত বলিয়া মনে করে। বুদ্ধিমনগণ নিজদিগকে এইরূপ দোষমুক্ত বলিয়া ধারণা করেন না। একদা হযরত ওমর (রা) হযরত হুযায়ফা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন- "রাসূলে মাক্‌বূল (সা) আপনার নিকট মুনাফিকদের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আপনি তাহাদের নিদর্শনাবলীর কোনটি আমার মধ্যে দেখিতে পাইতেছেন কি?" এইরূপে প্রত্যেকেরই স্বীয় দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক।

প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ আন্তরিক রোগের মহৌষধ ও শ্রেষ্ঠ জিহাদ—চিকিৎসায় সুফল লাভ করিতে হইলে প্রথমেই রোগ নির্ণয় করিয়া লওয়া দরকার। রোগ না চিনিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা যায় না। প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করাই সর্ববিধ হৃদরোগের মহৌষধ। এইজন্য আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى۔

অর্থাৎ "এবং যে ব্যক্তি (স্বীয়) আত্মাকে কু-প্রবৃত্তি হইতে দমিত রাখিয়াছে অবশ্যই বেহেশত তাহার বাসস্থান" (সূরা নাযিআত, রুকু ২, পারা ৩০)।

একদা রাসূলে মাক্‌বূল (সা) জিহাদ হইতে প্রত্যাবর্তন করত সাহাবা (রা)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন- "আমরা ক্ষুদ্র জিহাদে জয়ী হইয়া আসিলাম, না বৃহৎ জিহাদে?" সাহাবা (রা) নিবেদন করিলেন- "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা), বৃহৎ জিহাদ কাহাকে বলে?" রাসূলে মাক্‌বূল (সা) বলিলেন- "প্রবৃত্তির সঙ্গে লড়াই করাকে বৃহৎ জিহাদ বলে।"

রাসূলে মাক্‌বূল (সা) বলেন- "পরিশ্রমে তোমরা দুঃখিত হইও না এবং আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় তোমরা মনকে মোটেই অবকাশ দিও না। যদি দাও, তবে তাহাকে অন্যায় কাজে অবকাশ দিয়াছ বলিয়া সে কিয়ামতের দিন তোমার সহিত ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হইবে এবং তোমাকে তিরস্কার করিতে থাকিবে। এমনকি এই কারণে তোমার এক অঙ্গ অন্য অঙ্গের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধাইয়া লা'নত করিয়া বলিবে- 'আমাকে অন্যায় কাজে অবকাশ দিয়াছিলে কেন?"

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন- "নিতান্ত অবাধ্য ও দুর্দমনীয় পশুকে যেমন সুদৃঢ় লাগাম দিয়া রাখিতে হয়, তদপেক্ষা মজবুত ও কঠিন লাগাম দ্বারা মানুষের মনকে সর্বদা আবদ্ধ রাখা কর্তব্য।"

হযরত সররি সকতী (র) বলেন, "আখরোট ফল মধুতে ডুবাইয়া ভক্ষণ করিবার জন্য আমার মন চল্লিশ বৎসর যাবত আকাঙ্ক্ষা করিতেছে; কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি ভক্ষণ করি নাই।"

হযরত ইবরাহীম খাওয়াস (র) বলেন- "লাগাম পর্বতে গমনের পথে বহু ডালিমবৃক্ষে অসংখ্য সুন্দর পাকা ডালিম ঝুলিতেছে দেখিতে পাইলাম। ইহা দেখিয়াই আমার ডালিম খাইবার ইচ্ছা হইলে একটি ডালিম পাড়িয়া দানা মুখে দিলাম। কিন্তু ইহা নিতান্ত টক ছিল বলিয়া খাইতে না পারায় ফেলিয়া দিয়া পথ চলিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলাম, এক ব্যক্তি রাস্তায় পড়িয়া রহিয়াছেন এবং অগণিত বোল্‌তা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দংশন করিতেছে। আমি তাঁহাকে 'আস্‌সালামু আলায়কুম' বলিয়া অভিবাদন করিলাম। তিনি 'ওয়া আলায়কাস্‌সালাম ইয়া ইবরাহীম' বলিয়া জওয়াব দিলেন। আমি ইহাতে বিস্মিত হইয়া বলিলাম- 'হে দরবেশ, কিরূপে আপনি আমাকে চিনিলেন?' তিনি বলিলেন- 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে চিনে তাহার নিকট কিছুই গোপন থাকে না।' আমি বলিলাম- 'বুঝিলাম আল্লাহ্‌র সহিত আপনার প্রগাঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে অর্থাৎ আপনি তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র। তবে কেন বোল্‌তার দংশন হইতে মুক্তিলাভের জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন না?' তিনি উত্তর দিলেন- 'আপনিও ত আল্লাহ্‌র একজন বিশেষ প্রিয়পাত্র। আপনি কেন ডালিম ভক্ষণের অভিলাস হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করিলেন না? ডালিমের অভিলাষরূপ বোল্‌তার দংশনের ক্ষত ত পরলোকে প্রকাশিত হইবে এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা দিবে; অপরদিকে, এই বোল্‌তার দংশনের ক্ষত এই জড় জগতেই শেষ হইয়া যাইবে।"

প্রবৃত্তি দমনের উপকারিতা—যদিও জঙ্গলের ডালিম বৈধ ও ইহা ভক্ষণে কোন অন্যায় নাই, তথাপি ধর্মপরায়ণ সতর্ক ব্যক্তিগণ হালাল ও হারাম, এই উভয়ের লোভকে সমান অনিষ্টকর বলিয়া মনে করেন। তুমি যদি লোভ দমন না কর ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় অভাব অপসারণ করিয়া সন্তুষ্ট না হইতে পার, তবে তোমার প্রবৃত্তি অত্যন্ত লোভী হইয়া যাইবে এবং অবশেষে তোমার নিকট হারাম বস্তু যাঞ্চা করিতে থাকিবে। এইজন্য সতর্ক ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ হালাল বস্তুর লোভও বর্জন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রবৃত্তি যাহাতে লোভী হইতে না পারে, এইজন্য অতি যত্নের সহিত লোভের পথই তাহারা রুদ্ধ করিয়া দেন। ইহাতে এই সুফল দর্শে যে, হারামের লোভ হইতে তাঁহারা পূর্ণভাবে অব্যাহতি লাভ করেন। এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই হযরত ওমর (রা) বলেন- 'হারামে নিপতিত হওয়ার আশঙ্কায় আমি সত্তর বার হালাল দ্রব্য হইতেও হস্ত সংকুচিত করিয়া লই।"

আবার দেখ, হালাল দ্রব্য উপভোগ করিলেও মানব এক সুন্দর আস্বাদ লাভ করে। ফলে সংসারের প্রতি হৃদয়ের অনুরাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং পরিশেষে মন সংসারে আবদ্ধ

হইয়া যায়। তখন সংসার তাহার নিকট বেহেশতের মত সুন্দর বলিয়া মনে হয় এবং সে মৃত্যুকে অতি কঠোর বলিয়া ভয় করিতে থাকে; অতি সুখ ও আনন্দের লিপ্সায় যে উন্মত্ত হইয়া থাকে, তাহার মনে চিন্তাশূন্যতা দেখা দেয়; আল্লাহ্‌র যিকির ও মুনাজাত করিলেও সে উহার মাধুর্য এবং স্বাদ অনুভব করিতে পারে না। নিজকে হালাল দ্রব্য ভোগ করিতে না দিলে হৃদয় বিষণ্ন হয় ও মন ভাঙ্গিয়া পড়ে, সংসারের প্রতি মন অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হয় এবং পরকালের পরম সৌভাগ্য ও চরম আনন্দ লাভের নিমিত্ত হৃদয় অস্থির ও ব্যাকুল হয়ে উঠে। এইরূপ ভগ্নহৃদয়ের এক তসবীহ্ মনের উপরে যেরূপ প্রভাব বিস্তার করে, সুখের সময়ের শত শত তসবীহ্ এইরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় না।

একমাত্র আল্লাহ্-প্রেমের পথ উন্মুক্ত রাখা কর্তব্য—শিকারী বাজপাখির সঙ্গে মানব-প্রবৃত্তিকে তুলনা করা যাইতে পারে। বাজকে সুশিক্ষিত এবং আজ্ঞাধীন করিতে সমর্থ হইলেও ইহার সম্বন্ধে শিকারী উদ্বেগশূন্য হয় না; বরং শিকার ধরিয়া সে ঘরে ফিরিলে বাজের চক্ষুদ্বয় সেলাই করিয়া রাখে যেন অন্যান্য পদার্থ ইহার দৃষ্টিপথে পতিত না হয়। ইহার চক্ষু বন্ধ করিয়া না রাখিলে সে চতুস্পার্শ্বের দ্রব্যাদির প্রতি প্রলুব্ধ হইয়া শিকার ধরিবার শিক্ষা-দীক্ষা ভুলিয়া যাইতে পারে। এইরূপে চক্ষু বন্ধ রাখিয়া শিকারী প্রাণ রক্ষার জন্য বাজপাখিকে কিছু গোশত দেয়। মালিকের নিকট হইতে আহার্য পাইয়া বাজ তাহার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট ও আজ্ঞাধীন হইয়া উঠে।

শিকারী বাজকে যেরূপ সতর্কতার সহিত রাখে, মানব-প্রবৃত্তিকেও সেইরূপ সতর্কতার সহিত রাখা কর্তব্য। প্রবৃত্তিকে ইহার সমস্ত ভোগ্য দ্রব্য ও অভ্যাস হইতে বিরত রাখিয়া কেবল আল্লাহ্‌র প্রতি তাহাকে আসক্ত ও অনুরক্ত রাখিতে হইবে। প্রবৃত্তির যাবতীয় অভ্যাস পরিত্যাগ না করিলে এবং চক্ষু, কর্ণ, রসনা বন্ধ করিয়া নির্জনতা অবলম্বনপূর্বক মনকে ক্ষুধা, নির্বাকতা ও অনিদ্রার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করত কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত না করিলে সে আল্লাহ্‌র দিকে আকৃষ্ট হয় না। প্রাথমিক অবস্থায় ইহা খুব কষ্টসাধ্য বলিয়া মনে হইবে। প্রথম প্রথম দুগ্ধপোষ্য শিশুদেরকে মাতৃদুগ্ধ ছাড়ানও দুঃসাধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু কষ্টে-সৃষ্টে একবার দুধ ছাড়াইতে সমর্থ হইলে কিছু দিনের মধ্যে এমন হয় যে, বলপ্রয়োগে মাতৃস্তন দান করিলেও শিশু আর মাতৃদুগ্ধ পান করে না।

রিয়াযতের বর্ণনার সারাংশ—রিয়াযতের সারাংশ এই, যে দ্রব্য যাহার নিকট অধিক প্রিয়, তাহাকে সর্বপ্রথম সেই দ্রব্য পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং যে প্রবৃত্তি হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠে, ইহারই বিরুদ্ধাচরণ করিতে হইবে। মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি যাহার নিকট অধিক প্রিয়, অতি সত্বর উহা পরিত্যাগ করা তাহার কর্তব্য। ধন-সম্পদের প্রাচুর্যে যাহাদের মন আনন্দ পায়, অতি শীঘ্র তাহাদের ধন-সম্পদ বিতরণ ও ব্যয় করিয়া দেওয়া উচিত। সেইরূপ আল্লাহ্‌র প্রেম ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্যে যে ব্যক্তি আনন্দ পায়, বলপ্রয়োগে ইহা তাহার নিকট হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিতে হইবে।

অপরপক্ষে, যাহা মানুষের চিরকালের সাথী তৎপ্রতিই তাহার আসক্ত হওয়া আবশ্যক। মৃত্যুকালে যাহা বাধ্য হইয়াই ছাড়িয়া যাইতে হইবে, মৃত্যুরপূর্বেই স্বেচ্ছায় তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। কেবল আল্লাহ্‌ই মানুষের চিরকালের সাথী। এইজন্যই তিনি হযরত দাউদ (আ)-কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন- "হে দাউদ, আমিই তোমার একমাত্র সাথী; অতএব তুমিও আমার সাথী হইয়া থাক।" রাসূলে মাক্‌বূল (সা) বলেন, হযরত জিবরাঈল (আ) ফুৎকারে আমার অন্তরে এই বাণী প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন ঃ اَحْبِبْ مَا اَحْبَبْتَ فَاِنَّكَ مُفَارِقُه অর্থাৎ "যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে ভালবাস, কিন্তু নিশ্চয় জানিও তোমাকে ইহা একদিন ছাড়িতেই হইবে।"

সৎস্বভাবের নিদর্শন—আল্লাহ্ কুরআন শরীফে মুসলমানদের গুণরূপে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন উহাই সৎস্বভাবের নিদর্শন। তিনি বলেন ঃ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ الاية অর্থাৎ "নিশ্চয় মু'মিনগণ মুক্তি পাইয়াছে (অভীষ্ট লাভ করিয়াছে) সেই (মু'মিনগণ) যাহারা আপন নামাযের মধ্যে মিনতিকারী এবং অনর্থক (কাজ ও কথা) হইতে মুখ ফিরায় এবং যাহারা যাকাত পরিশোধ করে এবং যাহারা আপন লজ্জাস্থানগুলির রক্ষাকারী, কিন্তু নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি অথবা তাহাদের হাত যাহাদিগকে অধিকার করিয়াছে (সেই) বান্দীদের প্রতি, নিশ্চয় তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করা হয় নাই। অনন্তর যাহারা উহা ব্যতীত চেষ্টা করে অপিচ তাহারাই সীমালংঘনকারী এবং সেই (মু'মিন সকল) যাহারা নিজেদের আমানত দ্রব্যসমূহ ও নিজেদের অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং যাহারা আপন নামাযসমূহ রক্ষা করিয়া থাকে এই সকল লোকই উত্তরাধিকারী" সূরা মু'মিন রুকু ১, পারা ১)।

আল্লাহ্ সৎস্বভাবের নিদর্শন সম্বন্ধে আরও বলেন ঃ اَلتَّائِبُوْنَ الْعَابِدُوْنَ অর্থাৎ "তওবাকারী ইবাদতকারী" (সূরা তওবা, রুকু ১৪, পারা ১১)।

তিনি আরও বলেন ঃ وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا অর্থাৎ "এবং সেই সকল লোক আল্লাহ্‌র বান্দা যাহারা ভূতলে মৃদুভাবে পদবিক্ষেপ করিয়া নম্রতার সহিত চলে" (সূরা ফুরকান, রুকূ ৬, পারা ১৮)।

উল্লিখিতগুলিই মুসলমানের প্রকৃত গুণ এবং সৎস্বভাবের নিদর্শন। আর আল্লাহ্ মুনাফিকদের নিদর্শনাবলী বর্ণনাকালে যে সমস্ত দোষ-ত্রুটির উল্লেখ করিয়াছেন, উহা মন্দ স্বভাবের লক্ষণ।

মুমিন ও মুনাফিকদের তুলনা—রাসূলে মাক্‌বূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- "মুমিনের জীবনের লক্ষ্য নামায, রোযা এবং ইবাদত আর মুনাফিকদের জীবনের লক্ষ্য পশুর মত পানাহার।"

হযরত হাতিম আসাম (রঃ) বলেন- "মুসলমান কখনও নিশ্চিন্ত থাকে না; বরং সর্বদা সৎচিন্তা ও উপদেশ আহরণে ব্যগ্র থাকে; অপরদিকে, মুনাফিক সর্বদা লোভ ও কামনা-বাসনায় মগ্ন থাকে। মুসলমান খোদা ভিন্ন আর কাহাকেও ভয় করে না;

মুনাফিক কিন্তু খোদা ভিন্ন সকলের ভয়ে অধীর ও ব্যস্ত থাকে। মুসলমান এক খোদা ব্যতীত আর কাহারও আশা করে না; কিন্তু মুনাফিক এক খোদা ভিন্ন আর সকলেরই আশা করিয়া থাকে; মুসলমান স্বীয় ধন ধর্মকার্যে ব্যয় করিয়া থাকে; মুনাফিক কিন্তু অমূল্য ধনরত্ন সামান্য পার্থিব ধনের লালসায় বিসর্জন দিয়া থাকে। মুসলমান সর্বদা ইবাদতে মশগুল থাকে, কিন্তু তবুও যথাযথ ইবাদত হইল না বলিয়া আল্লাহ্‌র দরবারে রোদন করিতে থাকে; অপরপক্ষে, মুনাফিক সর্বক্ষণ পাপকার্যে রত থাকে, অথচ আমোদ-প্রমোদে কালাতিপাত করে। মুসলমান নির্জনতা পছন্দ করে; অপরপক্ষে, মুনাফিক লোকসংসর্গ ও সংসারের কোলাহলপূর্ণ জীবন যাপন করিতে ভালবাসে। মুসলমান যথাসাধ্য পরিশ্রম সহকারে ভূমি চাষ ও বীজ বপন করিয়াও ফসল লাভের সৌভাগ্য নসিবে হয় কিনা- এই আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত থাকে; অপরপক্ষে, মুনাফিক ভূমিও কর্ষণ করে না, বীজও বপন করে না, অপরের শ্রমে উৎপন্ন ফসলে নিজের গোলা ভর্তি করিবার কামনা করে।"

সৎস্বভাবসমূহ—কামিল ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত গুণরাজিকে সৎস্বভাবের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন- লজ্জাশীলতা, অল্প কথা বলা, দুঃখকে লঘু মনে করা, সত্য কথা বলা, সৌজন্য ও ঘনিষ্ঠতার সহিত সকলের সঙ্গে অবস্থান, কর্তব্যকার্যে যত্ন ও পরিশ্রম, অত্যধিক ইবাদত করা, অধিক ভুল-ত্রুটি না করা,অনাবশ্যক বিষয়ের প্রতি অনুরক্ত না হওয়া, বিশ্বপ্রেমিক হওয়া, সকলের মঙ্গল কামনা করা, মাহাত্ম্য, করুণা, ধীরতা, ধৈর্য, অল্পে তুষ্টি, কৃতজ্ঞতা, গম্ভীরতা, কোমল হৃদয়তা, অপরকে সহায়তা করিবার বাসনা, প্রলোভন হইতে বাঁচিবার শক্তি, অল্প আশা করা, অপরকে গালি না দেওয়া এবং অভিশাপও না করা, একের কথা অপরের নিকট না বলা, পরনিন্দা ও অশ্লীল কথা হইতে বিরত থাকা, হঠকারিতা না করা ও দুঃসাহস বর্জন করা, হিংসা-বিদ্বেষ বর্জন করা, প্রফুল্ল বদনে থাকা ও মিষ্ট কথা বলা, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের নিমিত্ত অপরের সহিত মিত্রতা বা শত্রুতা করা, ক্রোধ ও সন্তোষ শুধু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই হওয়া।

ধৈর্য সৎস্বভাবের নিদর্শন—ধৈর্য হইতে অধিকাংশ স্থলে সৎস্বভাবের পরিচয় মিলে। ধৈর্য সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা এস্থলে বর্ণনা করা যাইতেছে।

কাফিরগণ রাসূলে মাক্‌বূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিল এবং তাঁহাকে অসীম দুঃখ-কষ্ট দিয়াছিল, প্রস্তরাঘাতে তাহারা তাঁহার দাঁত পর্যন্ত ভাঙ্গিয়াছিল। তিনি এই সমস্ত অবিচার, অত্যাচার নির্বিকারচিত্তে সহ্য করিয়াছিলেন এবং আল্লাহ্‌র নিকট তাহাদের মঙ্গলের জন্য নিবেদন করিয়া বলিয়াছিলেন- 'হে আল্লাহ্, তাহাদের প্রতি দয়া কর, কারণ তাহারা অজ্ঞান, কিছুই বুঝে না।"

একদা হযরত ইবরাহীম আদহাম (র) এক নির্জন পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন। এমন সময় এক সৈনিকের সহিত তাঁহার সাক্ষাত ঘটিল। সৈনিক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা

করিল- "তুমি কি গোলাম?" তিনি বলিলেন- "হাঁ, আমি গোলাম।" সিপাহী আবার জিজ্ঞাসা করিল- "মানব বসতি কোন দিকে বলিতে পার?" হযরত ইবরাহীম আদহাম (র) বলিলেন- "কবরস্থান।" সিপাহী বলিল- "আমি লোকালয় তালাশ করিতেছি।" তিনি বলিলেন- "কবরস্থানই লোকের স্থায়ী বাসস্থান।" ইহাতে সৈনিক রাগান্বিত হইয়া হযরত ইবরাহীম আদহামের মস্তকে এতজোরে বেত্রাঘাত করিল যে, মস্তক বিদীর্ণ হইয়া রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া নগরের দিকে চলিল। লোকে ইহা দেখিয়া সিপাহীকে ভৎসনাপূর্বক বলিল- "বেটা নির্বোধ, কত বড় অন্যায় করিলে। ইনিই শ্রেষ্ঠ দরবেশ হযরত ইবরাহীম আদহাম (র)।" সৈনিক তৎক্ষণাত অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণপূর্বক হযরতের পদচুম্বন করিল এবং নিবেদন করিল- "আপনি স্বীয় পরিচয় না দিয়া কেন বলিলেন যে, আপনি গোলাম?" হযরত বলিলেন- "আমি স্বাধীন নই, বাস্তবিকই আমি আল্লাহ্‌র গোলাম।" সিপাহী সবিনয়ে আরয করিল- "না বুঝিয়া অন্যায় করিয়াছি; আমাকে মাফ করুন।"

হযরত ইবরাহীম আদহাম (র) সহাস্য বদনে বলিলেন- "তখনই তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছি। যে সময় তুমি আমার মস্তক বিদীর্ণ করিয়া দিলে তখনই তোমার মঙ্গল কামনা করিয়া আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করিয়াছি।" অভিশাপ না দিয়া দোআ করার কারণ লোকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- "আমি অবগত ছিলাম যে, তোমার বেত্রাঘাতের দরুন আমি প্রচুর পুণ্য লাভ করিব। সুতরাং যাহার কারণে আমি পুণ্য লাভ করিব, সেই ব্যক্তি আমার কারণে পাপী হইবে, ইহা আমি সমীচীন মনে করি নাই।"

হযরত আবূ উছমান হাইরীকে (র) এক ব্যক্তি নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। আহারে তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করা অপেক্ষা তাঁহার স্বভাব পরীক্ষা করাই সেই ব্যক্তির উদ্দেশ্য ছিল। হযরত তাহার দ্বারে উপস্থিত হইলে সে তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দিল না এবং বলিল- "সব শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন কিছুই খাইবার নাই, ফিরিয়া যাও।" ইহা শুনিয়া তিনি পূর্বের ন্যায় সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরিয়া চলিলেন। কিয়দ্দূর চলিয়া গেলে সেই ব্যক্তি আবার তাঁহাকে আহ্বান করিল। তিনি কোন আপত্তি না করিয়া আবার তাহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলে এবারও সে তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দিল না এবং পূর্বের ন্যায় বলিল যে, কিছুই খাইবার নাই। সেই ব্যক্তি কয়েকবারই এইরূপ করিল। তাঁহাকে আহবান করিলেই তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া অম্লান বদনে আগমন করিতেন এবং গৃহে প্রবেশ করিতে না দিয়া তাড়াইয়া দিলে নির্বিকারে চলিয়া যাইতেন। ইহাতে তিনি অসহিষ্ণু হইতেন না। ইহা দেখিয়া সেই ব্যক্তি অবশেষে নিবেদন করিল- "হে মহাত্মন, আপনাকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আমি এরূপ কাজ করিয়াছি। আমাকে মাফ করুন। বুঝিলাম আপনার স্বভাব অতি উত্তম।" ইহা শুনিয়া হযরত হাইরী (র) সেই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন- "এরূপ পরীক্ষা দ্বারা আমার মধ্যে কি গুণ দেখিতে পাইলে? এইভাবে আমাতে যে গুণ দেখিলে তাহাতো কুকুরের মধ্যেও আছে।

কুকুরকে আহ্বান করিলেই প্রসন্ন বদনে হাযির হইবে, আবার কিছু না দিয়া তাড়াইয়া দাও, নির্বিকার চিত্তে চলিয়া যাইবে। ইহাতে কি মাহাত্ম্য আছে?"

একদা জনৈক ব্যক্তি ছাদের উপর হইতে এক বড় রেকাবিপূর্ণ ছাই হযরত আবূ উছমান হাইরীর (র) মাথার উপর নিক্ষেপ করিল। এই দুর্ব্যবহারে তিনি ধৈর্যচ্যুত না হইয়া অম্লান বদনে তাঁহার পরিধানের পরিচ্ছদ ঝাড়িয়া লইলেন এবং আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দিলেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিল- "আপনার উপর ছাই নিক্ষেপ করাতে আপনি আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দিলেন কেন?" তিনি বলিলেন- "যে ব্যক্তি অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার উপযোগী তাহার উপর মাত্র ছাই নিক্ষেপ করা হইয়াছে, এইজন্যই আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দিলাম।"

হযরত আলী ইব্‌ন মূসা রেযার (র) দেহ ধূসর বর্ণের ছিল। নেশাপুরে তাঁহার গৃহের তোরণ দ্বারে একটি স্নানাগার ছিল। তিনি স্নানাগারে গমন করিলে অন্য কেহই তথায় থাকিত না। একদা তিনি উক্ত স্নানাগারে গমন করিলেন, এবং ইহা তাঁহার জন্য খালি করিয়া দেওয়া হইল। তিনি স্নানাগারে প্রবেশ করিলেন। ইতিমধ্যে উক্ত স্নানাগারের চৌকিদার অন্যমনস্ক হইয়া কোথায় চলিয়া গেল। এই সুযোগে এক গঁওয়ার ব্যক্তি স্নানাগারে প্রবেশ করিল। সে হযরত আলী ইব্‌ন মূসা রেযাকে (র) দেখিয়া তাঁহাকে স্নানাগারের একজন ভৃত্য বলিয়া মনে করিল এবং তাঁহাকে আদেশ করিল- "যাও, পানি লইয়া আস।" তিনি তৎক্ষণাত তাহাকে পানি আনিয়া দিলেন। সে গঁওয়ার আবার বলিল- "যাও মাটি লইয়া আইস।" তিনি তৎক্ষণাত তাহাকে মৃত্তিকাও আনিয়া দিলেন। এইরূপে সে গঁওয়ার হযরতকে আদেশের পর আদেশ দিতে লাগিল, আর তিনিও নির্বিকার চিত্তে সকল আদেশ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

অবশেষে চৌকিদার আসিয়া উপস্থিত হইল। উক্ত গঁওয়ার হযরতের প্রতি যে সকল আদেশ করিতেছিল সে উহা শুনিতে পাইল এবং তাঁহার প্রতি যে দুর্ব্যবহার করিতেছিল তাহাও দেখিল। চৌকিদারের অসাবধানতা ও অনুপস্থিতির দরুনই যে এই অঘটন ঘটিল, ইহা সে ভালরূপেই বুঝিতে পারিল। অতএব সে স্নানাগার হইতে পলায়ন করিল। হযরত স্নানাগার হইতে বহির্গত হইলে তাঁহাকে জানাইল যে, চৌকিদার স্বীয় অমার্জনীয় অপরাধের শাস্তির ভয়ে পলায়ন করিয়াছে। হযরত বলিলেন- "তাহাকে পালাইয়া যাইতে নিষেধ কর এবং বল যে, তাহার কোন দোষ নাই, বরং দোষ ঐ ব্যক্তির হইতে পারে যে কৃষ্ণবর্ণ কদাকার বান্দীর গর্ভে স্বীয় সন্তানের জন্ম দিয়াছে।"

হযরত আবদুল্লাহ (র) একজন কামিল দরবেশ ছিলেন। তিনি দর্জির কাজ করিতেন। এক অগ্নি উপাসক সর্বদা তাঁহার নিকট হইতে জামা-কাপড় ইত্যাদি সেলাই করাইয়া নিত। কিন্তু সেলাইয়ের পারিশ্রমিকরূপে সে সর্বদা তাঁহাকে জাল টাকা দিত এবং তিনি দেখিয়া শুনিয়াই বিনা আপত্তিতে এই জাল টাকা গ্রহণ করিতেন। একদা তিনি দোকানে ছিলেন না। অগ্নি উপাসক এমন সময় সেলাইয়ের পারিশ্রমিক দিতে আগমন করিল। কিন্তু হযরতের শিষ্য জাল টাকা দেখিয়া গ্রহণ

করিল না। দোকানে আসিয়া ইহা জানিতে পারিলে তিনি শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন- "তুমি পারিশ্রমিক গ্রহণ করিলে না কেন? বহু বৎসর যাবত এই অগ্নি উপাসক আমাকে জাল টাকা দিয়া আসিতেছে এবং আমি কখনও ইহা তাহার নিকট প্রকাশ করি নাই। বরং এই জাল টাকা দিয়া সে অপর মুসলমানকে ঠকাইবে ভাবিয়া সর্বদা উহা গ্রহণ করিয়াছি।"

হযরত উয়াইস করনী রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন কোন স্থানে গমন করিতেন তাঁহাকে পাগল মনে করিয়া বালকেরা তৎপ্রতি পাথর নিক্ষেপ করিত। তিনি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন- "হে প্রিয় বালকগণ, ছোট ছোট পাথর নিক্ষেপ করিও। বড় বড় পাথর নিক্ষেপ করিয়া আমার পা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হইতে পারিব না।"

হযরত আহ্‌নাফ ইব্‌ন কাইস (র) একদা রাস্তা দিয়া গমনকালে এক ব্যক্তি তাঁহাকে গালি দিতে দিতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তিনি নীরবে সব সহ্য করিয়া যাইতেছিলেন। তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের আপন লোকদের গৃহের নিকটবর্তী হইয়া দন্ডায়মান হইলেন এবং সেই ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন- "হে বন্ধু, গালিগালাজ আরও অবশিষ্ট থাকিলে উহাও এখনই আমাকে দিয়া দাও, অন্যথায় আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা যদি শুনে যে, তুমি আমাকে গালিগালাজ করিতেছ, তবে তাহারা তোমাকে যাতনা দিবে।"

একদা একজন স্ত্রীলোক হযরত মালিক ইব্‌ন দীনারকে (র) রিয়াকার (অর্থাৎ সুখ্যাতিপ্রিয় ও লোক দেখানো সৎকর্মশীল) বলিয়া আহ্বান করিল। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন- "হে পুণ্যশীলা রমণী, বস্‌রাবাসিগণ আমার প্রকৃত নাম ভুলিয়া গিয়াছিল। তুমি উত্তম করিয়াছ যে ইহা স্মরণ করাইয়া দিলে।"

পূর্ণমাত্রায় সৎস্বভাবের নিদর্শন—বুযুর্গগণ স্বভাবের যে সোপানে উপনীত হইয়াছেন উহাই পূর্ণমাত্রায় সৎস্বভাব। তাঁহারা অতি যত্নের সহিত কুস্বভাব হইতে নিজদিগকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করিয়া থাকেন। তখন আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুই তাঁহাদের নয়নগোচর হয় না এবং তাঁহারা অন্যকিছু দর্শন করিলে কেবল তাহা দ্বারাই দর্শন করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এই অবস্থাপ্রাপ্ত হয় নাই, সে যেন সৎস্বভাব অর্জন করিয়াছে বলিয়া অহঙ্কারে প্রবৃত্ত না হয়।

শিশুদের প্রতিপালন ও শিক্ষা—শিশু-সন্তানগণ মাতা-পিতার নিকট আল্লাহ্‌র পবিত্র আমানতস্বরূপ। তাহাদের হৃদয় পাক-পবিত্র বহুমূল্য রত্নের ন্যায়। তাহাদের পবিত্র অন্তরে এখনও দুনিয়ার আবিলতা ও পাপের ছাপ পড়ে নাই; উহা মোমের ন্যায় কোমল। যে চিত্রই অঙ্কন করিতে চাও উহাতে অতি সহজে অঙ্কন করিতে পারিবে; উহা কর্ষণোপযোগী উর্বরা পবিত্র ভূমি সদৃশ, যে বীজই উহাতে বপন কর না কেন, উত্তমরূপে অঙ্কুরিত হইবে। শিশুদের অন্তরে যদি সৎকর্ম ও সৎস্বভাবের বীজ বপন কর, তবে তাহারা উত্তরকালে ইহকাল পরকালের পরম সৌভাগ্য লাভে সমর্থ হইবে

এবং ইহার সুফল মাতা-পিতা ও শিক্ষকগণও ভোগ করিবে। আর যদি তাহাদের অন্তরে কুকর্ম ও কুস্বভাবের বীজ বপন কর, তবে তাহারা হতভাগ্য, দুশ্চরিত্র, দুরাচার ও পাপিষ্ঠ হইয়া উঠিবে এবং ইহার কুফলও মাতাপিতা এবং শিক্ষকগণকে ভোগ করিতে হইবে। এই জন্যই আল্লাহ্ আদেশ করিয়াছেন ঃ قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا অর্থাৎ "তোমাদের নিজদিগকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে দোযখের অগ্নি হইতে বাঁচাও।"

দুনিয়ার অগ্নির তুলনায় দোযখের অগ্নি কত ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক! দুনিয়ার অগ্নি, কষ্ট ও মসীবতে যাহাতে অবুঝ শিশুগণ নিপতিত না হয় তজ্জন্য মাতা-পিতা কত সযত্ন ও সতর্ক থাকে! কাজেই অনুধাবন কর, পরকালের চিরস্থায়ী অগ্নি, কষ্ট ও মসীবত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে সযত্ন ও সতর্ক হওয়া কতটুকু আবশ্যক। এইজন্যই তাহাদিগকে দোযখের আগুন হইতে রক্ষা করিতে আল্লাহ্ আদেশ করিয়াছেন।

শিশু সন্তানগণ যাহাতে উত্তরকালে আল্লাহ্র ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, তজ্জন্য তাহাদিগকে উত্তম শিক্ষা ও সৎস্বভাবে শিক্ষিত করিয়া তুলিবে। অসৎ সংসর্গ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে, কেননা অসৎ সংসর্গ হইতেই সমস্ত পাপের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তাহারা যেন উত্তম খাদ্য ও সুন্দর বসন-ভূষণের প্রতি আসক্ত না হয়। অন্যথা উহা ব্যতীত তাহারা চলিতে পারিবে না এবং উহা অর্জনেই তাহাদের সমস্ত জীবন বিনষ্ট হইয়া যাইবে। প্রথম হইতেই তাহাদের সুশিক্ষা ও সৎস্বভাবের জন্য যত্নবান হইবে।

শিশুর জন্য সতী-সাধ্বী ধাত্রী নিয়োগ—শিশুকে স্তন্যদান করিবার জন্য সতী-সাধ্বী, সৎস্বভাবী ও হালাল ভক্ষণকারী ধাত্রী নিযুক্ত করিবে: কারণ তাহার স্বভাব মন্দ হইলে এই মন্দ স্বভাব অলক্ষ্যে শিশু মনে প্রতিফলিত হইয়া যাইবে; ধাত্রী হারাম ভক্ষণ করিলে তাহার দুধও অপবিত্র হইবে। এই দুধ পান করিয়া শিশু লালিত পালিত ও বর্ধিত হইলে ইহার প্রভাব তাহার স্বভাবে থাকিয়া যাইবে এবং ইহার কুফল পরবর্তীকালে প্রকাশিত হইবে।

শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা—শিশু যখন প্রথম কথা বলিতে আরম্ভ করে, তখন সর্বপ্রথম যেন আল্লাহ্র নাম তাহার রসনা দ্বারা উচ্চারিত হয়। এইজন্য পূর্ব হইতেই তাহাকে আল্লাহ্র নাম শিখাইতে থাকিবে। কোন অসমীচীন বিষয়ে শিশু লজ্জাবোধ করিলে ইহাকে সৌভাগ্যের লক্ষণ বলিয়া মনে করিবে এবং শিশুর মধ্যে যে বুদ্ধিদীপ্তির প্রাধান্য রহিয়াছে ইহার প্রমাণস্বরূপ ধরিয়া লইবে। মন্দ কথায় ও কর্মে যদি শিশু অনুতপ্ত হয়, তবে মনে করিবে যে, তাহার বুদ্ধিমত্তা লজ্জাকে প্রহরীস্বরূপ তাহার উপর নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

আহারের আদব—শিশুর মধ্যে প্রথমত ভক্ষণ প্রবৃত্তি দেখা দেয়। অতএব আহারে রীতিনীতি, আদব-কায়দা তাহাকে শিক্ষা দিবে। ডান হাত দ্বারা 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলিয়া খাওয়া আরম্ভ করিতে হইবে। খুব ভালরূপে চিবাইয়া আস্তে আস্তে খাইতে

হইবে। অন্যের মুখের গ্রাসের দিকে দৃকপাত করা উচিত নয়। নিজের সম্মুখ হইতে লুকমা গ্রহণ করিবে এবং এক লুকমা খাওয়ার পূর্বে অন্য লুকমার দিকে হাত বাড়াইবে না। হাত ও কাপড়ে খাদ্য ভরিয়া লইবে না। কখন কখন শিশুকে তরকারী ব্যতীত রুটি খাইতে দিবে, যেন সে সর্বদা সুস্বাদু খাদ্য ভক্ষণে অভ্যস্ত না হইয়া যায়। অতিরিক্ত ভোজন যে মন্দ, ইহা তাহার নিকট প্রতিপন্ন করিয়া তুলিবে এবং বলিবে যে অতিরিক্ত ভোজন পশু ও নির্বোধদের কার্য। যাহারা অতিরিক্ত ভোজন করে তাহদের কুৎসা শিশুর নিকট বর্ণনা করিবে; সৎস্বভাবী লোকের প্রশংসা তাহার সম্মুখে বর্ণনা করিবে, তাহা হইলে সেও প্রশংসার লালসায় সৎস্বভাবী হইয়া উঠিবে।

শিশুদের পোশাক-পরিচ্ছদ—সাদা পোশাক পরিধান করা যে অধিক পছন্দনীয় ইহা শিশুর নিকট প্রতিপন্ন করিয়া তুলিবে এবং রেশমী ও রঙ্গিন কাপড় পরিধান করা যে মন্দ, ইহা তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দিবে। শিশুকে লক্ষ্য করিয়া বলিবে– "হে বৎস, রেশমী ও বিচিত্র রঙ্গের পোশাকে সজ্জিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করিও না, ইহা কুলটা রমণী ও নীচ শ্রেণীর লোকদের কাজ। কাপুরুষ ও রমণীগণই স্বীয় অঙ্গভূষণে লিপ্ত হয়; মানবের এই সমস্ত বাহ্য পোশাক-পরিচ্ছদের আবশ্যকতা নাই।"

শৈশবে সৎসংসর্গ—যে সকল বালক সুস্বাদু খাদ্য ও উত্তম বসন ভূষণে অভ্যস্ত তাহাদের সংসর্গে শিশুদিগকে বিদ্যালয়েও পাঠাইবে না। এইরূপ বালকদের নিকট হইতে শিশুদিগকে এত দূরে রাখিবে যেন তাহারা শিশুদের দৃষ্টিপথেও পতিত না হয়। তাহা না হইলে তাহাদের কুস্বভাব ও কুকর্মে শিশুগণ গা ভাসাইয়া দিয়া নিজেদের জীবন বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে। সন্তানগণ যাহাতে কুসংসর্গে পতিত না হয়, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে। কুসংসর্গ হইতে তাহাদিগকে সযত্নে রক্ষা না করিলে তাহারা লম্পট, লজ্জাহীন, চোর, মিথ্যাবাদী, অসভ্য ও পাপিষ্ঠ হইয়া উঠিবে বরং পরে বহু চেষ্টা করিলেও তাহাদের এই কুস্বভাব দূর করা দুঃসাধ্য হইয়া যাইবে।

শিশুদের প্রাথমিক পাঠ্য বিষয়—শিশুদিগকে বিদ্যালয়ে প্রথমে কুরআন শরীফ শিক্ষা দিবে, সৎ ও পরহেজগার লোকদের কাহিনী এবং সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম ও পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের নসীহত, রীতিনীতি, চালচলন সম্বলিত পুস্তকাদি পাঠ করিতে দিবে। উপন্যাস, নাটক, নভেল, নায়ক-নায়িকাদের প্রেমের কাহিনী, রমণীদের সৌন্দর্য-বর্ণনা ও প্রশংসাপূর্ণ পুস্তক ইত্যাদি কখনও তাহাদিগকে পাঠ করিতে দিবে না।

শিশুদের শিক্ষক নির্বাচন—শিশুদের শিক্ষক নির্বাচনেও সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। কেহ কেহ এইরূপ ধারণাও পোষণ করে যে, উপন্যাস, নাটক, নভেল, প্রেমের কাহিনী ইত্যাদি অধ্যয়নে মানুষের চতুরতা ও প্রতিভা বৃদ্ধি পায়। এই প্রকার লোক মনুষ্যরূপ শয়তান। সন্তানদের শিক্ষার ভার কখনও এমন লোকের উপর অর্পণ করিবে না। এইরূপ শিক্ষক শিষ্যদের অন্তরে কুস্বভাব ও কুকর্মের বীজ বপন করিয়া থাকে।

শিশুদের অন্যায় সংশোধন—শিশু-সন্তানগণ সৎকর্ম করিলে এবং সৎস্বভাবী হইলে এইজন্য তাহাদিগকে প্রশংসা করিবে; তাহাদের প্রিয় বস্তু তাহাদিগকে

পারিতোষিকস্বরূপ প্রদান করিবে এবং লোকসম্মুখেও তাহাদের সুখ্যাতি প্রকাশ করিবে। কোন সময় হঠাৎ তাহারা কোন অন্যায় করিয়া ফেলিলে দুই একবার উপেক্ষা করিয়া যাইবে। কেননা, প্রত্যেক ছোটখাট দোষ-ত্রুটিতে তাহাদের প্রতি রাগান্বিত হইলে এবং তাহাদিগকে তিরস্কার করিলে এইরূপ ক্রোধ ও ভৎসনায় অবশেষে কোন সুফল দর্শিবে না। মনে কর, তোমার শিশু সন্তান গোপনে কোন অন্যায় কাজ করিল; তুমি যদি তজ্জন্য তাহাকে বারংবার তিরস্কার করিতে থাক, তবে এই অন্যায় কার্যে তাহার সাহসিকতা বৃদ্ধি পাইবে এবং তখন সে প্রকাশ্যভাবে অন্যায় কাজ করিতে থাকিবে। আর সন্তান যদি বারংবার অন্যায় করিতে থাকে, তবে গোপনে একবার তাহাকে খুব তিরস্কার করিবে এবং বলিবে– "খবরদার, পুনরায় কখনও এরূপ অন্যায় কাজ করিবে না। লোকে যেন তোমার এই অন্যায় জানিতে না পারে, তাহা না হইলে তোমার দুর্নাম রটিবে এবং কেহই তোমাকে সম্মান করিবে না।"

শিশুদের শয্যা—নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও গাম্ভীর্য রক্ষা করিয়া পিতা স্বীয় সন্তানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে এবং সন্তানের মনে যেন পিতার ভয় জাগরিত থাকে, মাতা এইরূপ শিক্ষা দিবে। দিনের বেলা তাহাদিগকে শয্যা গ্রহণ করিতে দিবে না। তাহা না হইলে তাহারা অলস হইয়া যাইবে। রজনীতে তাহাদিগকে কোমল বিছানায় শুইতে দিবে না। শক্ত বিছানায় শুইলে তাহাদের শরীরও সুদৃঢ় ও শক্ত হইয়া কঠোর পরিশ্রমের উপযোগী হইবে।

শিশুদের খেলাধুলা—সন্তানগণ যাহাতে সক্রিয় ও উদ্যমশীল হইতে পারে তজ্জন্য সমস্ত দিনের মধ্যে তাহাদিগকে এক ঘন্টাকাল খেলাধুলার অনুমতি দিবে। তাহাদের হৃদয় যেন সঙ্কীর্ণ ও বিমর্ষ না হইয়া যায় তৎপ্রতিও বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে। সঙ্কীর্ণতা ও বিমর্ষতা হইতে ক্রমান্বয়ে শিশু-প্রকৃতি অসৎস্বভাব ধারণ করিতে পারে এবং অবশেষে ইহার ফলে তাহার মন অন্ধ হইয়া যাওয়াও বিচিত্র নয়।

শৈশবে দান ও নম্রতা শিক্ষার ব্যবস্থা—শৈশবকালেই সন্তানদিগকে বিনয় ও নম্রতা শিক্ষা দিবে। তাহারা যেন শৈশবকাল হইতে সকলের সহিত সবিনয় ও নম্র ব্যবহার করে এবং সমবয়স্ক বালক-বালিকাদের নিকট সংকোচহীনতা ও ধৃষ্টতা না দেখায়। অপর বালক-বালিকাদের নিকট হইতে যেন তাহারা কিছুই গ্রহণ না করে, বরং তোমার সন্তানের দ্বারা অন্যান্য বালক-বালিকাকে কিছু আহার্য সামগ্রী দানের ব্যবস্থা করিবে।

অন্যের গলগ্রহ হইতে নিবৃত্তি—সন্তানদিগকে খুব ভালরূপে বুঝাইয়া দিবে যে, কেবল ফকীর ও নির্জীব লোকেরাই অন্যের গলগ্রহ হইয়া থাকে। তাহাদিগকে এইরূপ সুযোগই দিবে না যাহাতে তাহারা অন্যের নিকট টাকা-পয়সা বা অন্য কোন বস্তু চাহিবার ইচ্ছা করিতে পারে। শিশুদিগকে এইরূপ প্রশ্রয় দিলে উত্তরকালে তাহারা প্রলোভনে পড়িয়া অন্যায় কাজে লিপ্ত হইবে এবং এইরূপে তাহাদের জীবন বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

শিশুদের আদব ও সবর—শিশুদিগকে সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিবে যে, লোকের সম্মুখে যেন তাহারা থুথু না ফেলে এবং নাক পরিষ্কার না করে; লোক সমাবেশে উপবেশন করিতে হইলে যেন আদবের সহিত উপবেশন করে এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ও সম্মানিত ব্যক্তিগণকে যেন পিছনে রাখিয়া উপবেশন না করে। তাহাদিগকে চিবুক হস্তের উপর রাখিয়া উপবেশনক করিতে দিবে না। এইরূপে বসা দুর্বলতার লক্ষণ। অতিরিক্ত কথা বলিতে তাহাদিগকে নিষেধ করিবে। তাহারা যেন কখনও শপথ না করে এবং জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বে নিজ হইতে যেন কোন কিছু না বলে।

বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে সম্মান করিবার জন্য তাহাদিগকে আদেশ করিবে এবং তাহাদের আগে আগে চলিতে নিষেধ করিবে। তাহারা যেন কাহাকে কখনও গালিগালাজ এবং অভিশাপ না করে। বালকদিগকে বুঝাইয়া বলিবে, "হে বৎসগণ, দোষ-ত্রুটির জন্য যদি উস্তাদ শাস্তি দেন তবে চীৎকার করিয়া রোদন করিও না এবং শাস্তি হইতে পরিত্রাণের নিমিত্ত কাহারও সুপারিশ উপস্থিত করিও না বরং উস্তাদের প্রহারে ধৈর্যাবলম্বন করিবে; কেননা ধৈর্যধারণ করা পুরুষের লক্ষণ, আর রোদন ও চীৎকার করা বান্দী-দাসী ও স্ত্রীলোকদের কাজ।"

বাল্য ও যৌবনে পাঠ্য বিষয়—সন্তান সাত বৎসরে উপনীত হইলে তাহাকে স্নেহের সহিত ওযু-গোসল প্রভৃতি শারীরিক পবিত্রতা বিধানের নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দিবে এবং নামায পড়িতে আদেশ করিবে। দশ বৎসর বয়সে নামাযে ত্রুটি করিলে তাহাকে মারিয়া-পিটিয়া নামায পড়িতে বাধ্য করিবে। চুরি, অবৈধ দ্রব্য ভক্ষণ ও মিথ্যা বলা যে মন্দ ও কুৎসিত, উহা তাহাকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিবে।

এই পদ্ধতিতে সন্তানদিগকে লালন পালন করিয়া তাহারা যৌবনে উপনীত হইলে এই সকল কর্ম, আদব-কায়দা ও রীতি-নীতির প্রকৃত তাৎপর্য তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবে। তাহা হইলে এই সমস্ত বিষয়ের সুফল তাহাদের অন্তরে প্রতিফলিত হইবে। তাহাদিগকে আহারের তাৎপর্য বুঝাইতে যাইয়া বলিবে– "আল্লাহ্ ইবাদতের জন্য মানব সৃজন করিয়াছেন, ইবাদতে শারীরিক শক্তি অর্জনের জন্যই কেবল আহারের প্রয়োজন। দুনিয়াতে সে মোসাফিরের ন্যায় আসিয়াছে, পরকালই তাহার প্রকৃত বাসস্থান। অতএব, পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করাই তাহার পার্থিব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। মৃত্যু অতি সত্বর, অকস্মাৎ ও অদৃশ্যভাবে আসিয়া মানুষকে এই জড়-জগত হইতে লইয়া যাইবে, দুনিয়া এইভাবেই পড়িয়া থাকিবে, সঙ্গে যাইবে না। অতএব যে ব্যক্তি চিরস্থায়ী ও পরম রমণীয় বেহেশতে প্রবেশ ও আল্লাহ্র প্রসন্নতা অর্জনের উদ্দেশ্যে পার্থিব জীবন খাটাইয়া পরকালের সম্বল সংগ্রহ করে সে-ই বুদ্ধিমান।"

এইরূপে তাহাদের নিকট দোযখের ভয়ঙ্কর অবস্থা এবং ভীষণ শাস্তির কথাও বর্ণনা করিবে। সৎকর্মের পুরস্কার ও কুকর্মের শাস্তি তাহাদিগকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিবে। এই নিয়ম-পদ্ধতিতে সন্তানদিগকে লালন পালন করিলে ও শিক্ষা দিলে সৎস্বভাবসমূহ তাহাদের অন্তরে প্রস্তরের উপর অঙ্কিত রেখার ন্যায় সুদৃঢ় ও মজবুত হইয়া থাকিবে। কিন্তু প্রথম হইতেই এই নিয়ম-পদ্ধতির ব্যতিক্রম করিয়া দুনিয়ার

আবিলতা ও কুসংসর্গে তাহাদিগকে অসহায় ছাড়িয়া দিলে এবং অধিক বয়স্ক হইলে উপদেশ দিতে শুরু করিলে, ইহাতে কোনই উপকার দর্শিবে না, বরং এই উপদেশ বাণী তখন প্রাচীর-পৃষ্ঠের ধুলিকণার ন্যায় তৎক্ষণাৎ ঝরিয়া পড়িবে।

হযরত সহল তস্তরীর (র) শৈশবকালীন শিক্ষা—হযরত সহল তস্তরী (র) বলেন– "আমার তিন বৎসর বয়সের সময় আমার মামা মুহাম্মদ ইব্ন সাওয়ারকে নামায পড়িতে দেখিয়া তাঁহার দিকে আমি চাহিয়া থাকিতাম। একদা তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন– 'হে বৎস, যে করুণাময় আল্লাহ্ তোমাকে পয়দা করিয়াছেন তাঁহার যিকির কর না কেন?' আমি বলিলাম– 'হে মাতুল, কেমন করিয়া তাঁহার যিকির করিতে হয় আমি ত জানি না।' তিনি বলিলেন– 'রজনীতে শয়ন করিবারকালে রসনাযোগে নয় বরং মনে মনে তিনবার বলিবে, আল্লাহ্ আমাকে দেখিতেছেন।'

"আমি কতক রজনীতে শয়নকালে ঐ বাক্যগুলি মনে মনে বলিয়া শয্যা গ্রহণ করিতাম। তৎপর তিনি বলিলেন– 'বৎস, ঐ কথাগুলি প্রত্যহ রজনীতে সাতবার বলিয়া শয্যা গ্রহণ করিবে'। আমিও তদ্রুপ করিতে লাগিলাম। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে এগারবার বলিবার জন্য তিনি আমাকে আদেশ করিলেন। আমিও তাঁহার আদেশ পালন করিয়া চলিলাম। কতক দিনের মধ্যেই ঐ কথাগুলির এক অপূর্ব মাধুর্য আমার মনে অনুভব করিতে লাগিলাম। এইরূপে একটি বৎসর অতিবাহিত হইল। তখন তিনি আমাকে বলিলেন– 'হে বৎস, তোমাকে আমি যাহা শিক্ষা দিয়াছি, আজীবন তাহা করিতে থাক; পরমবন্ধুরূপে ইহা তোমার ইহকাল পরকালে সহায়ক হইবে।' মামার আদেশানুসারে উক্ত বাক্যগুলি কয়েক বৎসর আমি অভ্যাস করিয়া চলিলাম এবং উহার মাধুর্য ও সুখাস্বাদ আমার অন্তরে ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। অবশেষে মামা একদিন আমাকে বলিলেন– 'হে বৎস, যে ব্যক্তির সহিত আল্লাহ্ থাকেন, যাহার দিকে আল্লাহ্ চাহিয়া আছেন এবং আল্লাহ্ যাহাকে দেখিতেছেন, সে কখনও আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কোন পাপকর্ম করিতে পারে না। সতর্ক হও বৎস, তুমি কখনও কোন গোনাহ করিও না, আল্লাহ্ অহরহ তোমাকে দেখিতেছেন।'

"তৎপর আমাকে বিদ্যালয়ে শিক্ষকের নিকট বিদ্যাভ্যাসের জন্য পাঠান হইল। প্রথম প্রথম আমার মন ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল, তাই একদিন আমি মামাকে বলিলাম– 'বহুক্ষণ উস্তাদের নিকট বিদ্যাভ্যাসে লিপ্ত থাকা আমার জন্য কষ্টকর হইতেছে। আমাকে প্রত্যহ এক ঘন্টার জন্য উস্তাদের নিকট প্রেরণ করুন। অবশেষে তাহাই করা হইল। এইরূপে সাত বৎসর বয়সের সময় আমি কুরআন শরীফ পড়িয়া লইলাম। দশ বৎসর বয়সের সময় আমার সর্বদা উপর্যুপরি রোযা রাখার অভ্যাস হইয়া গেল। সন্ধ্যাকালে যবের রুটি দ্বারা ইফতার করিতাম। এইরূপে আমার বার বৎসর বয়স কাটিয়া গেল। তের বৎসর বয়সের সময় ধর্ম বিষয়ে এক জটিল প্রশ্ন আমার হৃদয়ে উদিত হইল। স্বদেশের জ্ঞানীগণ এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে অক্ষম হইলে ইহার মীমাংসার জন্য আমি বস্‌রা নগরে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। অনুমতি লইয়া আমি বস্‌রায় গমন করিলাম। তথাকার বহু আলিমের নিকট আমার প্রশ্নের

মীমাংসা চাহিলাম; কিন্তু তাঁহাদের মীমাংসায় আমার সন্দেহ দূর হইল না। অবশেষে এক শ্রেষ্ঠ আবিদের সন্ধান পাইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলাম। তিনি অনায়াসে আমার সন্দেহ খন্ডন করিলেন। বহুদিন আমি তাঁহার সাহচর্যে ছিলাম এবং তৎপর স্বীয় মাতৃভূমি 'তস্তরে' প্রত্যাবর্তন করিলাম।

"স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর আমার কর্মধারা এইরূপ ছিল– আমি একবারে এক দেরেম মূল্যের যব কিনিয়া তদ্দ্বারা রুটি তৈয়ার করিয়া লইতাম। দিবসে বরাবর নিরবচ্ছিন্নভাবে রোযা রাখিতাম এবং সন্ধ্যাকালে ইফতার করিয়া এই শুষ্ক রুটি আহার করিতাম। রুটির সহিত কোন ব্যঞ্জন খাইতাম না। এইরূপে এক দেরেম মূল্যের যবে আমার এক বৎসরের খোরাক চলিত। তারপর দিবারাত্র কিছুই না খাইয়া রোযা রাখিবার অভ্যাস করিতে লাগিলাম। অল্প দিনের মধ্যেই আমি ইহাতে অভ্যস্ত হইয়া গেলাম। তৎপর পাঁচ দিবা-রাত্রি কিছুই না খাইয়া রোযা রাখিবার অভ্যাস করিয়া লইলাম। অবশেষে দিনের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া পাঁচ দিন হইতে সাত দিন এবং সাত দিন হইতে পঁচিশ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইলাম; অর্থাৎ পরিশেষে পঁচিশ দিবা-রাত্র নিরন্তর উপবাসে রোযা রাখিয়া পঁচিশ দিবসের শেষ সন্ধ্যাবেলায় শুধু শুষ্ক রুটি দ্বারা ইফতার করিয়া লইতাম। দিবসে এইরূপে রোযা রাখিতাম এবং তৎসঙ্গে সারা রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া আল্লাহ্র ইবাদত ও যিকির-শোগলে লিপ্ত থাকিতাম। এইভাবে বিশ বৎসর সবর করিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলাম।"

মহৎ ও শ্রেষ্ঠ কাজের বীজ শৈশবকালেই শিশুর অন্তরে বপন করা উচিত, ইহা বুঝাইবার জন্যই এই কাহিনী বর্ণিত হইল।

মুরীদের প্রাথমিক শর্তসমূহ ও রিয়াযত

ধর্মপথে না চলার কারণ– যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দরবারে উপনীত হয় নাই, তাহার কারণ কি এবং ইহার বাধা কোথায় জানিয়া লওয়া আবশ্যক। কেহ গন্তব্যস্থানে না পৌঁছিলে বুঝিতে হইবে যে, সে আদৌ পথ চলে নাই, পথ না চলার কারণ তালাশ করিলে বুঝা যাইবে যে, তাহার হৃদয়ে পথ চলার প্রেরণাই ছিল না; প্রেরণা না থাকা ও চলিবার চেষ্টা না করার কারণ অন্বেষণ করিলে দেখিবে, লক্ষ্যবস্তু বা গন্তব্যস্থান কত লোভনীয় ও উৎকৃষ্ট, ইহা সে অবগত নহে এবং ইহার উপর তাহার পূর্ণ ঈমান নাই। যে ব্যক্তি ভালরূপে অবগত হইয়াছে এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিয়াছে যে, দুনিয়া অপবিত্র, নিকৃষ্ট ও ক্ষণস্থায়ী বস্তু এবং পরকাল পরম রমণীয়, উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী, তাহার হৃদয়ে পরকাল লাভের প্রেরণা, আসক্তি ও পরকালের সম্বল সংগ্রহের যত্ন ও চেষ্টা স্বতঃই প্রকাশ পাইয়া থাকে। বৃহত্তর ও উৎকৃষ্ট পদার্থ লাভের লালসায় নিকৃষ্ট ও হীন পদার্থ পরিত্যাগ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য নহে। কেহ যদি জানে যে, অদ্য মৃৎপাত্র পরিত্যাগ করিলে কল্য সে বহুমূল্য স্বর্ণপাত্র লাভ করিবে, তবে তাহার পক্ষে

মৃৎপাত্র পরিত্যাগ করাও দুষ্কর নহে। কিন্তু এইরূপ স্বার্থত্যাগ একমাত্র দৃঢ় বিশ্বাসের ফলেই হইয়া থাকে।

আজকাল পরকালের প্রতি মানবের বিশ্বাস অত্যন্ত শিথিল। কারণ, পরকালের খাঁটি পথ-প্রদর্শক নিতান্ত দুর্লভ। পরহেজগার আলিমগণই প্রকৃত পথ প্রদর্শক ও ধর্মপথের উজ্জ্বল ভাস্কর। কিন্তু এইরূপ আলিম আজকাল দুনিয়া হইতে লোপ পাইয়াছে। প্রদর্শক শুণ্য পথটি মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। পরিচালক না থাকিলে পরিচালিত হইবে কিরূপে? এই জন্যই মানবসমাজ আজ সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিত। বর্তমান কালে আলিমই খুব বিরল। তদুপরি তাহাদের হৃদয়ে সংসারাসক্তি অত্যন্ত প্রবল। পথ প্রদর্শকই পথভ্রান্ত হইয়া দুনিয়া অনুসন্ধানে ব্যাপৃত, এমতাবস্তায় কিরূপে তাহারা দুনিয়া হইতে মানবজাতিকে পরকালের দিকে পরিচালিত করিবে? এতদ্ব্যতীত দুনিয়া ও আখিরাতের পথ পরস্পর ভিন্নমুখী। পূর্বদিকের ঠিক বিপরীত দিকে যেমন পশ্চিমদিক, দুনিয়া ও আখিরাতের পথও ঠিক তদ্রূপ। সুতরাং মানব একটির নিকটবর্তী হইলে অপরটি হইতে দূরে সরিয়া যায়।

যাঁহারা আল্লাহ্‌র অনুকম্পা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেই তিনি বলেন ঃ وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا অর্থাৎ "এবং যে ব্যক্তি পরকালের কামনা করে এবং তাহার জন্য চেষ্টা করে যেরূপ চেষ্টা করা উচিত।" এই আয়াতে আল্লাহ্ পরকালের জন্য যথাযোগ্য চেষ্টা করিবার আদেশ দিয়াছেন। সুতরাং সেই চেষ্টা কিরূপ এবং কিরূপেই বা সেই চেষ্টা করিতে হইবে, ইহা প্রত্যেকেরই জানিয়া রাখা আবশ্যক।

ধর্মপথ-যাত্রীর প্রাথমিক রিয়াযত– উল্লিখিত আয়াতে سَعٰى অর্থাৎ চেষ্টার মর্ম হইল পথ চলা। পথ চলার প্রথম সোপানেই কতিপয় শর্ত রহিয়াছে। পথ চলিতে হইলে অবশ্যই এই শর্তসমূহ পালন করিতে হইবে। পরিশেষে একটি দুর্গ রহিয়াছে, ইহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

ধর্মপথ যাত্রীর প্রথম সোপান

প্রতিবন্ধক দূরীকরণ– উল্লিখিত শর্তসমূহের প্রথম শর্ত এই, তোমার ও আল্লাহ্‌র মধ্যে যতগুলি পর্দা বা প্রতিবন্ধক আছে উহা ছিন্ন করিতে হইবে। তাহা হইলে তুমি এই সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا

"এবং আমি তাহাদের সম্মুখে এক প্রাচীর এবং পশ্চাতে এক প্রাচীর স্থাপন করিয়াছি" (সূরা য়াসীন, রুকূ ১, পারা ২২)। রিয়াযত পথের পর্দা বা প্রতিবন্ধকসমূহ চারিভাগে বিভক্ত– (১) ধন, (২) সম্মান, (৩) অন্ধ অনুকরণ ও (৪) পাপ।

ধন—ইহা এক ভীষণ অন্তরায়। ধনাসক্তি মানব মনে এত কঠিন বন্ধন সৃষ্টি করে যে, ইহা ছিন্ন করা দুষ্কর এবং ইহা হইতে নিস্তার না পাইলে আধ্যাত্মিক পথেও চলো যায় না। মানুষকে তাহার শরীর খাটাইয়া আত্মোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হয়। অতএব তাহার শরীর সুস্থ ও সবল রাখা দরকার এবং এইজন্য তাহার আহারের আবশ্যক। আবার আহার সংগ্রহের জন্য ধনের প্রয়োজন। এইরূপে অত্যাবশ্যক পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য মানবীয় প্রয়োজন মিটানোর জন্যও ধনের আবশ্যকতা রহিয়াছে। অপরদিকে, ধনাসক্তি ছিন্ন না করিলে ধর্মপথে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নহে। এমতাবস্থায়, জীবন ধারণ উপযোগী নিতান্ত আবশ্যক দ্রব্যাদি সংগ্রাহ করা যাইতে পারে, এই পরিমাণ ধনে সন্তুষ্ট থাকিয়া অবশিষ্ট ধন নিজ হইতে সরাইয়া দিতে হইবে। এইরূপ আবশ্যক পরিমাণ ধনে হৃদয় লিপ্ত ও আসক্ত হয় না। অপরদিকে, যে ব্যক্তি কপর্দকহীনভাবে একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করিয়া সাধনায় লিপ্ত থাকে, তাহার পক্ষে গন্তব্যস্থলে পৌঁছা নিতান্ত সহজসাধ্য হয়।

সম্মান—সম্মান কামনা একটি ভীষণ বাধা এবং যত্নের সহিত ইহাও ছিন্ন করিতে হইবে। ইহার উপায় এই– যে স্থানে লোকে তোমাকে সম্মান করে, সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া এমন স্থানে গমন করিবে যেখানে কেহই তোমাকে জানে না, কারণ যশ ও সুখ্যাতি হইয়া গেলে লোক সংসর্গে থাকিবার ও তাহাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা আকর্ষণের চেষ্টায়ই তুমি লিপ্ত হইয়া পড়িবে। যে ব্যক্তি লোক সংসর্গে আনন্দ পায়, সে কখনও আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে সমর্থ হয় না।

অন্ধ অনুকরণ—কোন ব্যক্তি কাহারও মতের প্রতি আস্থাবান হইলে অপর বিরুদ্ধ মতের উপর দোষারোপ করত সে স্বীয় গৃহীত মত রক্ষার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে। এমতাবস্থায়, অন্য কোন মতকে তাহার অন্তরে স্থান দিবার অবকাশ থাকে না। এইজন্যই অন্ধ অনুকরণ ধর্ম পথযাত্রীর অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং ভিন্নমতের প্রতি এইরূপ একগুঁয়ে মনোভাব সযত্নে পরিহার করিতে হইবে।

অবশেষে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' (আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই) কলেমার প্রকৃত মর্মের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং ইহার মর্ম হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে কিনা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে। উক্ত কলেমার সারমর্ম এই- আল্লাহ্ ব্যতীত আর কিছুই উপাসনার উপযোগী নাই, এমন কোন ব্যক্তি, শক্তি বা বস্তু নাই যাহার আদেশ পালন করিয়া জীবন যাপন করা যাইতে পারে। লোভ যাহার হৃদয়ে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, বুঝিতে হইবে লোভই তাহার উপাস্য হইয়া পড়িয়াছে। তদ্রূপ অন্য কোন ভাব বা বস্তু যেন হৃদয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া ইহাকে ব্যাকুল করিয়া না তোলে। এইরূপ ভাব ও বস্তু হইতে হৃদয়ের অব্যাহতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা আবশ্যক। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য সকল পদার্থের প্রভাব হইতে হৃদয়কে মুক্ত করিতে হইলে কঠোর সাধনা ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে।

হৃদয়ের উপর আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে কঠোর সাধনা ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। এতদ্ব্যতীত ধর্মমত-পার্থক্যের বাদানুবাদ এই ক্ষেত্রে কোন কাজেই লাগে না।

পাপ—ধর্মপথ-যাত্রীর কঠিনতম প্রতিবন্ধক পাপ। কারণ, পাপ করিলে তৎক্ষণাৎ ইহার ছাপ হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় এবং হৃদয় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া পড়ে। বার বার পাপানুষ্ঠানে ক্রমান্বয়ে হৃদয় গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। আল্লাহ্‌র অনুকম্পার ছায়া এইরূপ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হৃদয়ে কিরূপে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে? অবৈধ উপায়ে অর্জিত জীবিকা গ্রহণে হৃদয় গভীর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। হালাল জীবিকা হৃদয়কে এত উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত করে যে, আর কিছুতেই তদ্রূপ হয় না। কিন্তু হারাম উপায়ে অর্জিত জীবিকা এই আলোকরশ্মি বিনষ্ট করিয়া দেয়। অতএব হারাম দ্রব্য হইতে দূরে সরিয়া পড়িবে এবং হালাল দ্রব্য ব্যতীত কখনও গ্রহণ করিবে না। যে ব্যক্তি শরীয়তের প্রকাশ্য আদেশ অনুসারে চলে না এবং যাবতীয় কাজ-কারবার, লেনদেন তদনুযায়ী পরিচালনা করে না, ধর্ম ও শরীয়তের মর্ম তাহার নিকট উদ্ঘাটিত হউক এইরূপ আশা করা দুরাশা মাত্র। সে ঐ ব্যক্তি সদৃশ যে আরবী বর্ণ পরিচয়ের পূর্বে কুরআন শরীফ ও ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা অধ্যয়নের আশা করে।

যথারীতি ওযু-গোসল করিয়া পবিত্র বস্ত্র পরিধান করিলে যেমন মানুষ নামাযে দণ্ডায়মান হওয়ার উপযোগী হয় তদ্রূপ ধর্মপথযাত্রী উল্লিখিত চতুর্বিদ অন্তরায় ছিন্ন করিলে সে আধ্যাত্মিক পথে চলিবার উপযোগী হয়।

ধর্মপথ-যাত্রীর দ্বিতীয় সোপান

পীরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস- পূর্বেই বলা হইয়াছে, ধর্মপথে চলিবার সময় মানুষকে কতকগুলি বিপদসঙ্কুল ভয়ের স্থান পার হইতে হয়। অপরিচিত ও অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে একাকী পথ চলাতে সমূহ বিপদের আশঙ্কা রহিয়াছে। এইজন্য কামিল পীর বা পথপ্রদর্শকের অনুসন্ধান করিতে হইবে। কামিল পীর হইলে তাহার হস্তে নিজেকে সমর্পণ করিয়া দেওয়া মুরীদের উচিত। নিজের বাসনা-কামনা ও মতামত বিসর্জন দিয়া পীরের আনুগত্য ও নেতৃত্ব মানিয়া লওয়া এবং হৃষ্টচিত্তে তাঁহার আদেশ পালন করা মুরীদের কর্তব্য। কামিল পীরের সাহায্য ব্যতীত এই পথে চলা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কারণ, ইহা প্রকাশ্য স্থূল রাজপথ নহে, বরং এই পথ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য। আল্লাহ্ পর্যন্ত একটিমাত্র সরল পথ রহিয়াছে। কিন্তু শয়তান এই পথে অসংখ্য বেড়াজালের সৃষ্টি করিয়াছে, সহস্র-সহস্র ভ্রান্ত পথের আবিষ্কার করিয়া যাত্রীদিগকে বিভ্রান্ত ও গুমরাহ করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত রহিয়াছে। এমতাবস্থায়, সুনিপুণ ও অভিজ্ঞ পথ-প্রদর্শক ব্যতীত এইরূপ বিপদসঙ্কুল রাস্তায় কিরূপে চলা সম্ভবপর হইতে পারে?

উপযুক্ত পীরের হাতে নিজের যাবতীয় বিষয় সমর্পণ করিয়া দিবে। এমন কি, তোমার সামান্য কাজও নিজের দায়িত্বে রাখিবে না। দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে যে, তোমার সুচিন্তিত ও অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত অপেক্ষা পীরের ভ্রম অধিক মঙ্গলজনক। অভিজ্ঞ পীরের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস ও তাঁহার আনুগত্য স্বীকারকেই ইতঃপূর্বে সনদ বলা হইয়াছে। পীরের কোন কার্য বা বাক্যের মর্ম বুঝিতে অক্ষম হইলে হযরত খিযির (আ) ও হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনা স্মরণ করিবে। পীর ও মুরীদগণের উদ্দেশ্যেই ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

কামিল পীরগণ এমন অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব জানেন যাহা মুরীদগণ বুঝিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। বিশ্ববিখ্যাত হাকীম জালীনূসের যমানায় এক ব্যক্তির ডান হাতের আঙ্গুলে বেদনা হইয়াছিল। অনভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বেদনার স্থানে ঔষধ মালিশ করিতেছিল, কিন্তু ইহাতে বেদনা উপশম হইতেছিল না। জালীনূস পীড়িত ব্যক্তির পৃষ্ঠের বাম পার্শ্বে ঔষধ দিতে লাগিলেন। ইহাতে অনভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলিতে লাগিল "কি নির্বোধের কাজ! অঙ্গুলিতে বেদনা, আর পৃষ্ঠে ঔষধ? ইহাতে কি লাভ হইবে?" কিন্তু জালীনূসের চিকিৎসায় রোগীর অঙ্গুলির বেদনা উপশম হইল। তিনি আরও অবগত ছিলেন যে, স্নায়ু সকল মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যে স্নায়ু বাম দিক হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা দেহের ডান দিকে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; যে স্নায়ু ডান দিক হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা দেহের বাম দিকে চলিয়া গিয়াছে। মুরীদগণ যাহা বুঝিতে অক্ষম তেমন বিষয়ে তাহারা যেন মাথা না ঘামায়, এই উদ্দেশ্যেই উপমাটি বর্ণিত হইল।

হযরত খাজা বূ-আলী (র) একদিন তদীয় পীর হযরত শায়খ আবুল কাসিম গার্গানীর (র) নিকট স্বীয় স্বপ্ন-বিবরণ প্রদান করিতেছিলেন। তখন হযরত শায়খ (র) রাগান্বিত হইয়া পূর্ণ এক মাস তাঁহার সহিত কোন কথাবার্তা বলেন নাই; তাঁহার ক্রোধের কারণও তিনি অবগত ছিলেন না। তৎপর হযরত শায়খ (র) একদিন হযরত খাজা বূ-আলী (র)-কে স্বপ্ন বিবরণ প্রদানকালে তুমি বলিয়াছিলে, আমি যেন তোমাকে কোন কার্যের আদেশ দিতেছি, আর স্বপ্নেই তুমি ইহার উত্তরে বলিলে, 'কেন করিব?' হযরত শায়খ (র) আবার বলিলেন- "লক্ষ্য কর, আমার আদেশের প্রতি তোমার সন্দেহের অবকাশ না থাকিলে স্বপ্নেও তুমি 'কেন করিব' এই বাক্য বলিতে না।"

ধর্মপথ-যাত্রীর তৃতীয় সোপন

নির্জনে অনাহারে অনিদ্রায় কালাতিপাত—কামিল পীরের হস্তে মুরীদ তাহার সমস্ত কাজ সমর্পণ করিলে তিনি তাহাকে একটি দুর্গের সন্ধান দান করেন, যাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিলে সকল বিপদাপদ হইতে মুক্ত হইয়া সে আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর

হইতে পারে। চারিটি প্রাচীর এই দুর্গ পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। প্রাচীরগুলি এই- প্রথম নির্জনতা, দ্বিতীয় নীরবতা, তৃতীয় ক্ষুধা ও চতুর্থ অনিদ্রা। ক্ষুধা দ্বারা শয়তানের পথসমূহ রুদ্ধ হইয়া পড়ে। অনিদ্রা দ্বারা হৃদয় আলোকিত হয়। নীরবতা অতিরিক্ত বাক্যালাপের কলুষতা হইতে হৃদয়কে রক্ষা করে এবং নির্জনবাস লোকসমাজে অবস্থানজনিত মলিনতা হইতে মনকে বিশুদ্ধ রাখে; চক্ষু ও কর্নের পথসমূহও নির্জনবাসে রুদ্ধ হইয় থাকে।

হযরত সহল তস্তুরী (র) বলেন- "যে সকল দরবেশ আব্‌দালশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা নির্জনবাসে নীরবতা অবলম্বন করত ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অনিদ্রায় কালাতিপাত করিয়াছেন বলিয়াই এত উন্নত শ্রেণীতে উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন।"

ধর্মপথ-যাত্রীর দ্বিতীয় রিয়াযত

কুপ্রবৃত্তি দমন—উল্লিখিত পার্থিব সম্বন্ধ হইতে পূর্ণ মুক্তি লাভ করিলে মুরীদ পথ চলিবার উপযুক্ত হয়। পথ চলিতে থাকিলে কতকগুলি ধ্বংসকারী কণ্টকাকীর্ণ বন-জঙ্গল তাহার নয়নগোচর হইবে। গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইতে হইলে তাহাকে সর্বপ্রথম এই সমস্ত বন-জঙ্গল কাটিয়া রাস্তা পরিষ্কার করিয়া লওয়া আবশ্যক। মানুষের কুপ্রবৃত্তিসমূহই এই ধ্বংসকারী কণ্টকাকীর্ণ বন-জঙ্গল। কুপ্রবৃত্তির সহিত জড়িত সকল বিষয় তাহাকে অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে। সম্মান-লিপ্সা, প্রভুত্ব-প্রিয়তা, ধনাসক্তি, উৎকৃষ্ট পানাহারের ইচ্ছা, উত্তম বসন-ভূষণের লালসা, অহমিকা, রিয়া প্রভৃতি মনোভাবে কুপ্রবৃত্তির মূল প্রোথিত রহিয়াছে। অতএব যে কার্যের সহিত কুপ্রবৃত্তির কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া জানিতে পারিবে, তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে হৃদয় ছিন্ন করিয়া লইবে। তাহা হইলেই চলার পথের সমস্ত ধ্বংসকারী কণ্টাকাকীর্ণ বন-জঙ্গল বিদূরিত হইবে এবং যাবতীয় আবিলতা ও মলিনতা হইতে হৃদয় পাক-পবিত্র হইয়া উঠিবে।

প্রতিটি মানুষের অন্তরেই সকল কুভাব প্রবল হইয়া রহে নাই। যে ব্যক্তি যে কুভাব পোষণ করে তাহার হৃদয়ে সেই কুভাব প্রবল হইয়া উঠে। এইরূপে কাহারও হয়ত একটি, কাহারও দুইটি বা ততোধিক কুভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। মনে কর, কাহারও অন্তরে মাত্র একটি কুভাব প্রবল হইয়া রহিয়াছে। এমতাবস্থায়, ইহা হইতেও তাহার হৃদয় পবিত্র করিতে হইবে। ইহা বলিলে চলিবে না যে, সমস্ত কুভাব দমন হইয়া মাত্রা একটা থাকিলে কি অনিষ্ট করিবে? তবে ইহা দমন করিতে নিজের মনগড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে না; বরং অভিজ্ঞ পীর যে ব্যবস্থা প্রদান করেন তদনুযায়ী কার্য করিবে। কারণ, স্মরণ রাখিও, অভিজ্ঞ পীরগণ অবস্থা বিশেষে এই ব্যবস্থারও পরিবর্তন-পরিবর্ধন করিয়া থাকেন।

ধর্মপথ-যাত্রীর তৃতীয় বা শেষ রিয়াযত

আন্তরিক যিকির—কুভাবসমূহ দমন হইয়া গেলে উর্বর ও কর্ষিত ক্ষেত্রের মত মানব হৃদয় বীজ বপনের উপযোগী হইয়া উঠে এবং তখনই বীজ বপন শুরু করিবে। আল্লাহ্‌র যিকির এই বীজ। আল্লাহ্ ব্যতীত সকল কল্পনা হইতে অন্তর মুক্ত করিয়া নির্জনে বসিয়া মনে ও মুখে 'আল্লাহ্, আল্লাহ্' বলিতে থাকিবে। এইরূপ যিকির সর্বদা করিতে থাকিলে এমন এক সময় আসিবে যখন মুখের শব্দ রুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং তখন কেবল হৃদয়ের মধ্যে ঐ যিকির সংযুক্ত হইয়া উচ্চারিত হইতে থাকিবে। ক্রমে ক্রমে এমন অবস্থা প্রাপ্ত হইবে যে, হৃদয়ও তখন 'আল্লাহ্' শব্দ উচ্চারণে অনুভূতিশূন্য হইয়া পড়িবে এবং ইহার মর্ম ও উদ্দেশ্যমাত্র তখন অন্তরে প্রবল হইয়া থাকিবে। মর্মটি কোন অক্ষর দ্বারা আবদ্ধ ও পরিবেষ্টিত নয়; ইহাতে কোন অক্ষর নাই; ইহা না আরবী, না ফারসী।

'আল্লাহ্' শব্দ উচ্চারণ না করিয়া হৃদয় দ্বারা অসাড়ে যিকির করাও এক প্রকার বাক্য। শব্দটি গূঢ় মর্মের আচ্ছাদনমাত্র। ইহা বীজ নহে, বরং মর্মই বীজ। সুতরাং এই মর্ম অন্তরে এইরূপ স্থায়ী, সুদৃঢ় ও প্রবল করিয়া তুলিতে হইবে যেন বিনা চেষ্টায় অন্তর ইহার সংস্রব রক্ষা করিয়া চলিতে পারে। বরং এই সংস্রব এত দৃঢ় করিয়া লওয়া উচিত যে, উহা ছিন্ন করিতে গেলে যেন অন্তরে ভীষণ আঘাত লাগে তবুও ইহা ছিন্ন হয় না। হযরত শিবলী (র) স্বীয় মুরীদকে আদেশ করিয়াছিলেন- "এক শুক্রবার হইতে অপর শুক্রবার পর্যন্ত তোমার হৃদয়ে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন পদার্থের চিন্তা আসিলে, আমার নিকট তোমার আগমন হারাম।" পার্থিব সকল সংস্রব, চিন্তা ও কুপ্রবৃত্তির কণ্টক হইতে অন্তর নির্মুক্ত করত তথায় আল্লাহ্‌র যিকিররূপ বীজ বপন করিতে পারিলে মুরীদের শ্রমসাধ্য তখন আর কিছুই থাকে না।

রিয়াযতের পরবর্তী অবস্থার প্রতীক্ষা—আল্লাহ্‌র যিকিররূপ বীজ অন্তরে বপন করা পর্যন্ত ক্রিয়া-কলাপের সহিত তাহার চেষ্টার সংস্রব ছিল তৎপর ধর্মপথযাত্রী শুধু 'কি ঘটিবে' 'কি ফল প্রকাশিত হইবে' এই অধীর প্রতীক্ষায় কালযাপন করিবে। কঠোর সাধনায় যে বীজ সে বপন করিয়াছে প্রবল আশা যে, ইহা বিনষ্ট হবে না। এই সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْلَهُ فِىْ حَرْثِهٖ -

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আখিরাতের চাষ চাহে আমি তাহার জন্য তাহার চাষের মধ্যে বৃদ্ধি দেই।" এই সোপান সমাগত হইলে বিভিন্ন মুরীদ বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোন মুরীদের অন্তরে 'আল্লাহ্' শব্দের নানাবিধ মর্ম উদিত হইতে থাকে; আবার কখন কখন নানারূপ ভ্রান্ত ধারণাও জাগিয়া উঠে। শেষোক্ত অবস্থা হইতে কেহ

কেহ মুক্তি পাইলেও ফেরেশতাগণের আকৃতি ও আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামের আত্মাসমূহ নানা প্রকার রমণীয় আকৃতিতে তাহারা দেখিতে পায়। কখন কখন এই দৃশ্যসমূহ স্বপ্নেও দেখা যায়; আবার কোন কোন সময় জাগ্রত অবস্থায়ও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তৎপর মুরীদগণ আরও নানাবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই গ্রন্থে উহার বিস্তারিত বর্ণনা সম্ভবপর নহে। আর বর্ণনা করিলেও কোন লাভ নাই। রাস্তার দৃশ্যের বর্ণনা করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্যও নহে, বরং কিরূপে পথ চলিতে হয়, ইহা দেখাইয়া দেওয়াই উদ্দেশ। আর পথ চলিবার সময় নিজেই-ত সব কিছু দেখিতে পাইবে।

বিভিন্ন ব্যক্তির সম্মুখে বিভিন্ন পদার্থ আসিয়া উপস্থিত হয়। এই পথের যাত্রীদের পক্ষে কি কি পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয় উহার পূর্বাভাষ না দেওয়াই ভাল। পূর্বেই শ্রবণ করিলে উহাদের দর্শনেচ্ছা হৃদয়ে উদিত হইয়া ইহাই তাহার চলার পথের অন্তরায় হইয়া উঠে। অতএব এই সোপানে উপনীত হইয়া কি ঘটে ও কি প্রকাশিত হয়, এই প্রতীক্ষায় থাকাই বাঞ্ছনীয়।

ইহাই যাহিরী ইলমের শেষ সীমা। ইহার পর কি হইবে, কি ঘটিবে বাহ্যজ্ঞান তাহা বলিতে পারে না। কিন্তু ভালরূপে জানিয়া রাখ, এই সমস্ত অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত না থাকিলেও অবশ্য সত্য বলিয়া ইহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। ইহা বলার উদ্দেশ্য এই যে, কোন কোন লোক উহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহারা বাহ্যজ্ঞানের বহির্ভূত কোন কিছুই বিশ্বাস করেন না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভোজন-লিপ্সা ও কামরিপু

দেহে উদর একটি জলাধারতুল্য এবং ইহা হইতে যে সমস্ত শিরা-উপশিরা নিঃসৃত হইয়া সর্বদেহে বিস্তৃত হইয়াছে উহারা ঐ জলাধার হইতে নির্গত পয়ঃপ্রণালীস্বরূপ। উদর হইতেই মানবের সকল বাসনা-কামনা জন্মিয়া থাকে। জন্ম হইতেই ভোজন-স্পৃহা মানব হৃদয়ে দেখা দেয়। এইজন্যই ইহা তাহার হৃদয়ে এত প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে যে, কোন মতেই ইহাকে সম্পূর্ণরূপে দমন করা যাইতে পারে না। এই কারণেই মানবের আদি পিতা হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম বেহেশ্‌ত হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন।

ভোজন-স্পৃহা সকল প্রবৃত্তির মূল। ভোজনে উদর তৃপ্ত হইলেই কামভাব উত্তেজিত হইয়া উঠে। ধন ব্যতীত মানবের ভোজন-স্পৃহা ও কামরিপু চরিতার্থ করা যায় না। অতএব ভোজন-লালসা ও কামভাবের সাথে সাথেই মানব হৃদয়ে ধনাসক্তি জাগরিত হয়। ধন সংগ্রহ করিতে সুখ্যাতি ও প্রভুত্বের প্রয়োজন হয়। এই কারণে মানব হৃদয়ে সুখ্যাতি-প্রিয়তা ও প্রভুত্ব-লালসা জন্মিয়া থাকে। সুখ্যাতি ও প্রভুত্ব রক্ষা করিতে গিয়া লোকের সঙ্গে কলহ-বিবাদ ও সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে হয়। আর সংঘর্ষ হইতেই মানব হৃদয়ে সাধারণত ঈর্ষা, অহঙ্কার, পক্ষপাতিত্ব, শত্রুতা, রিয়া, মনোমালিন্য প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং অনুধাবন কর, ভোজন-প্রবৃত্তিকে ইহার স্বাভাবিক গতিতে বর্ধিত হইতে দিলে এই মূল শিকড় হইতেই সকল কুপ্রবৃত্তি মাথা তুলিয়া উঠে। অপরপক্ষে, ভোজন-প্রবৃত্তিকে দমন ও আজ্ঞাবহ রাখিতে পারিলে এবং সর্বদা ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করিবার শক্তি অর্জন করিতে পারিলে, ইহাই আবার সকল কল্যাণের মূল উৎসস্বরূপ হইয়া থাকে।

এই অধ্যায়ে ক্ষুধার ফযীলত ও উপকারিতা এবং অল্পাহারের অভ্যাস গঠনের নিমিত্ত কি নিয়ম-পদ্ধতিতে চেষ্টা করিতে হইবে, তদ্বিষয় বর্ণিত হইবে। পরিশেষে কামরিপু হইতে কি কি অপবাদ দেখা দেয় এবং ইহা দমনে কি কি কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে ইহাও প্রদর্শিত হইবে।

হাদীসে ক্ষুধার ফযীলত—রাসূলে মাক্‌বূল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "তোমরা স্বীয় প্রবৃত্তির সঙ্গে ক্ষুৎপিপাসা দ্বারা যুদ্ধ কর। ইহাতে তোমরা কাফিরদের সঙ্গে জিহাদের সওয়াব সদৃশ সওয়াব লাভ করিবে এবং আল্লাহ্‌র নিকট কোন দ্রব্যই ক্ষুৎপিপাসা অপেক্ষা অধিক প্রিয় নহে।" তিনি বলেন- "যে ব্যক্তি উদর পূর্ণ করিয়া ভোজন করে, তাহার জন্য স্বর্গরাজ্যের দ্বার উন্মোক্ত হইবে না।" কতিপয় লোক রাসূলে মাক্‌বূল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল- "ইয়া

রাসূলাল্লাহ্, কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ?" তিনি বলিলেন- "যে ব্যক্তি অল্প ভোজন করে, অল্প হাসে এবং ছতর ঢাকিবার মত বস্ত্রে পরিতৃপ্ত হয়।" তিনি বলেন- "ক্ষুধা সমস্ত কাজের সরদার।" তিনি অন্যত্র বলেন- "পুরাতন কাপড় পরিধান কর এবং অর্ধ পেট পুরিয়া পানাহার কর; উহা নবীগণের আচরণের এক অংশ।" তিনি বলেন- 'ধ্যান করা অর্ধেক ইবাদত এবং অল্পাহার পূর্ণ ইবাদত।" তিনি বলেন- "তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট উত্তম, যে অধিক পরিমাণে ধ্যান করে এবং অল্প পরিমাণে ভোজন করে; আর তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্র বড় শত্রু যে অধিক পরিমাণে পানাহার করে এবং অধিক নিদ্রা যায়।"

তিনি বলেন- "যে ব্যক্তি অল্প ভোজন করে, ফেরেশতাগণের নিকট আল্লাহ্ তাহার প্রশংসা করিয়া বলেন- 'হে ফেরেশতাগণ, দেখ, আমি তো ঐ ব্যক্তিকে ভোজন-স্পৃহায় জড়িত রাখিয়াছি; কিন্তু সে আমার সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্ত ভোজন পরিত্যাগ করিয়াছে। হে ফেরেশ্তাগণ, সাক্ষী থাক, এই ব্যক্তি যত গ্রাস কম আহার করিবে, আমি তাহাকে বেহেশ্তে তত সোপান সমুন্নত করিয়া দিব।" তিনি বলেন- "অধিক পানাহার দ্বারা অন্তর নির্জীব করিও না। অন্তর শস্যক্ষেত্রস্বরূপ, অতিবৃষ্টি হইলে ইহার শস্য নষ্ট হইয়া যায়।" তিনি বলেন- "মানবের পক্ষে পূর্ণ করিবার যতগুলি পাত্র আছে তন্মধ্যে উদর সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। মানুষের মেরুদণ্ড বলবান ও সবল রাখিবার নিমিত্ত (যাহাতে সে দাঁড়াইতে পারে) যে কয়েক গ্রাস খাদ্যের আবশ্যক, এই পরিমাণ ভোজন যথেষ্ট। ইহার অতিরিক্ত ভোজন করিতে হইলে উদরের এক তৃতীয়াংশ খাদ্য দ্বারা, এক-তৃতীয়াংশ পানি দ্বারা পূর্ণ করিবে এবং অবশিষ্ট অংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখিবে।" হাদীসের অন্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, "এক-তৃতীয়াংশ যিকিরের জন্য শূন্য রাখিবে।"

হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম বলেন- "তোমরা নিজদিগকে বসনশূন্য ও ক্ষুধার্ত রাখ, তাহা হইলে তোমাদের হৃদয় আল্লাহ্র দর্শন লাভ করিবে।" রাসূলে মাক্বুল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "রক্ত প্রবাহের মত শয়তান মানব শরীরের শিরায়-শিরায় চলাচল করে। ক্ষুৎপিপাসা দ্বারা তোমরা শয়তানের পথ সংকুচিত কর।" তিনি বলেন- "মুমিন এক আঁতড়ি পূর্ণ করিয়া আহার করে, আর মুনাফিক সাত আঁতড়ি পূর্ণ করিয়া আহার করে।" অর্থাৎ মুসলমানের আহারের তুলনায় মুনাফিকের আহার সাতগুণ বেশী। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হা বলেন- "রাসূলে মাক্বূল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলিলেন- 'বেহেশ্তের দ্বারে সর্বদা ধাক্কা দিতে থাক, তাহা হইলে উহা উন্মুক্ত হইবে।' আমি আরয করিলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্, কিরূপে বেহেশ্তের দ্বারে ধাক্কা দিতে থাকিব?' তিনি বলিলেন- 'ক্ষুৎপিপাসা দ্বারা।"

একদা রাসূলে মাক্বূল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে হযরত হুযায়ফা রাযিয়াল্লাহু আন্হুর উদ্গার উঠিল। হযরত (সা) তাঁহাকে বলিলেন- "এই উদ্গার দূর

কর। কারণ, যে ব্যক্তি এই দুনিয়াতে তৃপ্তির সহিত ভোজন করিবে, পরকালে সে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত থাকিবে।" হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হা বলেন- "রাসূলে মাক্বুল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কখনও তৃপ্তির সহিত ভোজন করেন নাই। কখন কখন তাঁহার অত্যধিক ক্ষুধাদৃষ্টে তাঁহার উপর আমার দয়ার উদ্রেক হইত এবং আমি তাঁহার পবিত্র উদরে হাত বুলাইতাম এবং আরয করিতাম- 'আমার দেহ মন আপনর জন্য উৎসর্গ হউক, যে পরিমাণ খাইলে ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, সেই পরিমাণ ভোজনে কি আপত্তি আছে?' তিনি বলিতেন, হে আয়েশা, আমার অগ্রবর্তী শ্রেষ্ঠ পয়গম্বর ভ্রাতৃগণ আল্লাহ্র নিকট হইতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন; আমি যদি খুব তৃপ্তিপূর্বক আহার করি, তবে আমার মর্তবা তাঁহাদের মর্তবা অপেক্ষা কম হইয়া যায় কিনা, আমার এই আশঙ্কা হয়। তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া পরকালের গৌরব খর্ব করা অপেক্ষা সামান্য কয়দিন (ক্ষুধার যন্ত্রণা) সহ্য করা আমার নিকট অধিক প্রিয় এবং আমি আমার ভ্রাতৃগণের নিকট পৌঁছিব, ইহা অপেক্ষা অধিক প্রিয় আমার নিকট আর কিছুই নাই।"

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "আল্লাহ্র শপথ, এই উক্তির পর রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক সপ্তাহের অধিক কাল বাঁচিয়া ছিলেন না।" একদা হযরত ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা এক খন্ড রুটি লইয়া রাসূলে মাক্বূল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলেন। হযরত (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন- 'ইহা কি?' তিনি বলিলেন- 'আমি একখানা রুটি প্রস্তুত করিয়াছি। আপনাকে না দিয়া ইহা খাইয়া ফেলিতে আমার ইচ্ছা হইল না।' হযরত (সা) বলিলেন, 'তিনদিন (অনাহারের) পর ইহাই প্রথম তোমার পিতার মুখে প্রবেশ করিবে।"

মহামনীষীদের উক্তিতে ক্ষুধার ফযীলত—হযরত আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলে মাক্বুল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের গৃহে একাদিক্রমে তিনদিন গমের রুটি কেহই আহার করেন নাই।" হযরত আবূ সুলায়মান দারানী (র) বলেন, "সারা রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া প্রভাত কাল পর্যন্ত নামাযে লিপ্ত থাকা অপেক্ষা রজনীতে এক গ্রাস কম ভোজন করাকে আমি অধিক পছন্দ করি।" হযরত ফুযায়ল (র) নিজেকে সম্বোধন করিয়া বলেন, ক্ষুধিত থাকিতে তুমি কেন ভয় কর? হায়! হায়! আল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও তাঁহার প্রিয়জনকে যে ক্ষুধা প্রদান করিয়াছেন, তুমি ইহাতে পরিতাপ করিতেছ?" হযরত কাহ্মাশ (র) নিবেদন করিতেন- " হে খোদা, আমাকে তুমি অনুবস্ত্রহীন রাখিয়া থাক, আবার রজনীতে আমাকে তোমার সহবাসে নির্জনে স্থান দান কর। তুমি ত তোমার প্রিয়জনের সহিতই এইরূপ আচরণ করিয়া থাক; কিরূপে আমি এইরূপ সৌভাগ্য লাভ করিলাম?" হযরত মালিক ইব্ন দীনার (র) বলেন, "যে ব্যক্তি অভাব মোচন উপযোগী খাদ্য পাইয়া পরমুখাপেক্ষী হয় না, সেই পরম সুখী।" হযরত মুহাম্মদ ইব্নে ওয়াসি (র) বলেন, "না, না, বরং ঐ ব্যক্তিই সুখী, যিনি সকাল-সন্ধ্যায় সর্বদা ক্ষুধার্ত থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর বিধানে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন।"

হযরত সহল তস্তুরী (র) বলেন- "বুযুর্গগণের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, ক্ষুধা অপেক্ষা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলজনক পদার্থ আর কিছুই নাই এবং পরিতৃপ্ত আহার অপেক্ষা পারলৌকিক হানিকর বস্তু আর নাই। হযরত আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন যায়িদ (র) বলেন- "একমাত্র ক্ষুধার যাতনা সহ্য করার জন্যই আল্লাহ্ মানুষকে ভালবাসিয়া থাকেন; এতদ্ব্যতীত আর কোন কারণই নাই যদ্দরুন তিনি মানুষকে ভালবাসিতে পারেন। একমাত্র ক্ষুধার কল্যাণেই মানুষ পানির উপর দিয়া চলিতে পারে এবং একমাত্র ক্ষুধার দরুনই মানুষ ভূমি আঁকড়াইয়া ধরে।" হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে চল্লিশ দিন হযরত মূসা আলায়হিস সালাম আল্লাহ্র সহিত কথা বলিয়াছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে তিনি কিছুই ভোজন করেন নাই।

ক্ষুধার উপকারিতা ও পরিতৃপ্ত ভোজনের অপকারিতা

ক্ষুধার ফযীলতের কারণ—ঔষধ কটু বলিয়া ইহার কোন ফযীলত নাই; বরং পীড়া দূর করিয়া স্বাস্থ্য দান করিতে পারে বলিয়াই ইহার এত ফযীলত। তদ্রূপ ক্ষুধা কষ্টদায়ক বলিয়াই ইহার কোন ফযীলত নাই। বরং ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগে যে মঙ্গল ও উপকারিতা নিহিত রহিয়াছে তদ্দরুনই ইহার এত ফযীলত। ক্ষুধা হইতে নিম্নবর্ণিত দশ প্রকার উপকার পাওয়া যায়।

প্রথম উপকারিতা—ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগে আত্মা স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন ও দীপ্তিমান হয়। উদর পূর্ণ থাকিলে আত্মা অন্ধকারাচ্ছন্ন ও স্মরণশক্তি নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলে এক প্রকার উত্তাপ মস্তকে প্রবেশ করিয়া মানুষকে বুদ্ধিহীন করিয়া তোলে, এমনকি তাহার কল্পনা ও উদ্ভাবন-শক্তি বিক্ষিপ্ত ও অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। এইজন্যই রাসূলে মাক্বুল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "অল্প ভোজনে স্বীয় হৃদয়কে জীবন্ত কর এবং ক্ষুধা দ্বারা ইহাকে পবিত্র কর। তাহা হইলে হৃদয় নির্মল, সুস্থ ও কার্যদক্ষ হইবে।" অন্যত্র তিনি বলেন- "যে ব্যক্তি নিজেকে ক্ষুধার্ত রাখে তাহার অন্তর নিতান্ত দীপ্তিশালী হয় এবং তাহার বুদ্ধির বিচক্ষণতা বৃদ্ধি পায়।" হযরত শিব্লী (র) বলেন, "আমার এমন কোনদিন অতিবাহিত হয় নাই যেদিন আমি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ক্ষুধার্ত হইয়া বসিয়াছিলাম, অথচ হিক্মত ও উপদেশ গ্রহণশক্তি আমার অন্তরে সজীব হইয়া উঠে নাই।"

রাসূলে মাক্বূল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "উদার পূর্ণ করিয়া ভোজন করিও না, তাহা হইলে তোমার অন্তরে আল্লাহ্- পরিচয়ের আলো নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে।" মা'রিফাত (আল্লাহ্- পরিচয়) বেহেশ্তের পথ এবং ক্ষুধা মা'রিফাতের দরগাহ্। এই কারণেই অনাহারে থাকাকে বেহেশ্তের দ্বারে ধাক্কা দেওয়া বলে, যেমন রাসূলে মাক্বুল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "তোমরা ক্ষুধা দ্বারা সর্বদা বেহেশ্তের দ্বারে ধাক্কা দিতে থাক।"

দ্বিতীয় উপকারিতা—ক্ষুধায় মন কোমল হয় এবং যিকির ও মোনাজাতের আস্বাদ লাভ করে। পরিতৃপ্ত ভোজনে মন কঠিন হইয়া পড়ে এমনকি যিকিরের মাধুর্য মানব অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না, রসনার অগ্রভাগ হইতেই ইহা নিঃশেষ হইয়া যায়। হযরত জুনায়দ বাগ্দাদী (র) বলেন, " যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাহার মধ্যস্থলে ভোজনের থলিয়া রাখিয়া মোনাজাতের মাধুর্য লাভ করিতে চাহে, কখনও তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না।"

তৃতীয় উপকারিতা—ক্ষুধার ফলে অহঙ্কার ও গাফ্লত (কর্তব্য কার্যে অমনোযোগিতা) অপসারিত হয়। অহঙ্কার ও গাফ্লত দোযখের দ্বার; পক্ষান্তরে, ভগ্নহৃদয়তা, সহায়সম্বলহীনতা ও দারিদ্র্য বেহেশ্তের দ্বার। পরিতৃপ্ত ভোজনে অহঙ্কার ও গাফ্লত জন্মে এবং ক্ষুধা মানবকে অসহায়, দীন ও ভগ্নহৃদয় করিয়া দেয়। মানব যতক্ষণ নিজেকে অত্যন্ত অসহায় ও উপায়হীন বলিয়া মনে করিতে না পারে এবং এক গ্রাস অন্ন সংগ্রহে অক্ষম হইয়া সমস্ত জগত অন্ধকারাচ্ছন্ন না দেখে, ততক্ষণ সে আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব ও শক্তি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। বিশ্বের সমস্ত ধন-ভাণ্ডারের কুঞ্জিসমূহ রাসূলে মাক্বুল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করত বলিলেন- উহার স্পৃহা আমার নাই, বরং একদিন অনাহারে থাকা ও পরদিন ক্ষুধা নির্বাপিত করাকে আমি অধিক ভালবাসি। যেদিন অনাহারে থাকিব সেই দিন ধৈর্য ধারণ করিব, আর যেদিন ক্ষুধা নির্বাপিত করিব সেইদিন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব।"

চতুর্থ উপকারিতা—সর্বদা উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিলে লোকে ক্ষুধার্ত ব্যক্তির কষ্ট বুঝিতে পারে না, অতঃপর তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশের সুবিধাও সেই পাইতে পারে না এবং পরকালের আযাবের কথাও সে ভুলিয়া যায়। তুমি ক্ষুধার্ত থাকিলে দোযখবাসীদের ক্ষুধার কথা তোমার স্মরণ হইবে, পিপাসার্ত হইলে কিয়ামত দিবসে সমবেত জনতার পিপাসার বিষয় তোমার স্মরণ হইবে। পরকালের ভয় ও আল্লাহ্র বান্দাগনের প্রতি দয়া প্রকাশ বেহেশ্তের দ্বারস্বরূপ। এই কারণেই লোকে যখন হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল- "সমস্ত জগতের ধনাগার আপনার নিকট থাকা সত্ত্বেও আপনি ক্ষুধার্ত থাকেন কেন?" তখন তিনি বলিলেন- "তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলে দরিদ্রগণকে ভুলিয়া যাইতে পারি; আমার এই আশঙ্কা হয়।"

পঞ্চম উপকারিতা—প্রবৃত্তি দমন করা মানুষের পরম সৌভাগ্যের বিষয়; আর নিজেকে প্রবৃত্তির বশবর্তী করিয়া রাখা তাহার চরম দুর্ভাগ্য। দুর্দমনীয় পশুদিগকে একমাত্র ক্ষুধা দ্বারাই আজ্ঞাবহ করা চলে। তদ্রূপ মানব প্রবৃত্তি দমন করিতে হইলেও ক্ষুধা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। প্রবৃত্তিসমূহকে সংযত করা ক্ষুধার একমাত্র উপকারিতা নহে, বরং ক্ষুধাকে সকল উপকারের পরশমণি বলা যাইতে পারে। কারণ, প্রবৃত্তির তাড়না হইতেই সমস্ত পাপ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং প্রবৃত্তির তাড়না পরিতৃপ্ত ভোজনেই জন্মে।

হযরত যুণ্নুন মিস্‌রী (র) বলেন- "আমি যখনই তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়াছি, আমার হৃদয়ে তখনই কোন পাপ বা পাপের বাসনা প্রবিষ্ট হইয়াছে।" হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বলেন- "রাসূলে মাক্‌বুল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর সর্বপ্রথম যে বিদ্‌আতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা উদর পূর্ণ করিয়া আহার করা। তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলে মানব হৃদয়ে প্রবৃত্তিসমূহ সবল হইয়া উঠে। ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করিলে বহু কল্যাণ ও উপকারিতা লাভ করা যায়। কিন্তু এই সকল বাদ দিলেও ইহাতে যে কামরিপু নিস্তেজ হয় এবং বাহুল্য কথনের ইচ্ছা হ্রাস পায় ইহাই যথেষ্ট। যে ব্যক্তি তৃপ্তির সহিত আহার করে সে বাহুল্য কথা ও পরনিন্দায় প্রবৃত্ত হয় এবং তাহার কামরিপু প্রবল হইয়া উঠে।

মানুষ চেষ্টা দ্বারা অন্যান্য আচরণ হইতে স্বীয় ইন্দ্রিয়কে বাঁচাইতে সমর্থ হইলেও অসংযত দৃষ্টি হইতে চক্ষুকে রক্ষা করা বড় দুরূহ ব্যাপার। আবার চক্ষুকে বাঁচাইতে পারিলেও অন্তরকে অসঙ্গত কল্পনা হইতে বিরত রাখা অত্যন্ত দুষ্কর। একমাত্র ক্ষুধা মানুষকে এই আপদসমূহ হইতে রক্ষা করিতে পারে। এইজন্যই বুযুর্গগণ বলেন- "আল্লাহ্‌র ধনাগারে ক্ষুধা একটি অমূল্য রত্ন। তিনি সকলকে ইহা দান করেন না, একমাত্র তাঁহার প্রিয়জনকে ইহা দান করিয়া থাকেন।" একজন অভিজ্ঞ হাকিম বলেন- "কেহ এক বৎসরকাল তরকারি ব্যতীত শুষ্ক রুটি তাহার অভ্যাসের অর্ধেক পরিমাণ ভক্ষণ করিলে আল্লাহ্ তাহার মন হইতে রমণী-চিন্তা সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া দিবেন।"

ষষ্ঠ উপকারিতা—যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত থাকে তাহার নিদ্রাও হ্রাস পায়। অল্প নিদ্রা হইলে ইবাদত ও যিকির-ফিকিরের সুবিধা পাওয়া যায়। বিশেষভাবে রাত্রিকালই ইবাদতের উৎকৃষ্ট সময়। যে ব্যক্তি তৃপ্তির সহিত আহার করে, তাহার উপর নিদ্রা প্রবল হইয়া উঠে এবং নিদ্রার প্রভাবে সে মৃত্যের ন্যায় পড়িয়া থাকে। এইরূপে তাহার অমূল্য জীবন বৃথা নষ্ট হইয়া যায়। একজন কামিল পীর প্রত্যহ রাত্রে ভোজনের সময় বলিতেন- "হে শিষ্যগণ, অধিক ভোজন করিও না; অধিক ভোজন করিলে অধিক নিদ্রা যাইতে হইবে। তাহা হইলে কিয়ামত দিবসে তোমাদিগকে অধিক অনুশোচনা করিতে হইবে।" সত্তর জন মহামনীষী সিদ্দীক একমতে বলিয়াছেন- "অধিক পানি পান করিলে নিদ্রার উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।"

পরমায়ু মানবের একমাত্র অমূল্য সম্পদ এবং প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস তাহার এক একটি অমূল্য রত্ন। ইহার পরিবর্তে পরকালের পরম সৌভাগ্য লাভ করা যাইতে পারে। অপরপক্ষে, অপনিদ্রায় জীবন বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব যে বস্তু সেই নিদ্রাকে অপসারিত করে, ইহা অপেক্ষা অধিক প্রিয় আর কি থাকিতে পারে? রাত্রিকালে তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া গভীর নিদ্রায় আবিষ্ট হইলে তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য জাগ্রত হইলেও ভরা উদরে নামায পড়িতে কষ্ট হয় এবং মোনাজাতের আস্বাদ পাওয়া যায় না; নিদ্রা তখন তাহার উপর প্রবল থাকে। এতদ্ব্যতীত পরিতৃপ্ত আহারের ফলে রজনীতে

স্বপ্নদোষও হইতে পারে। এমতাবস্থায়, গোসলের কোন সুবিধা সে নাও পাইতে পারে। গোসলের কোন সুবিধা না পাইলে সারা রাত্রি অপবিত্রাবস্থায় কাটাইতে হয়। ইহাতে ইবাদত হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। গোসলের সুবিধা পাইলেও ইহার কষ্ট অথবা ভোগ করিতে হয়। আরামের সহিত হাম্মামে গোসল করিবার পয়সা হয়ত তাহার নিকট নাও থাকিতে পারে। আবার হাম্মামে গমন করাও নিরাপদ নহে। তথায় কোন যুবতীর প্রতি দৃষ্টি পতিত হইলে ইহাতে বহু বিপদের আশংকা রহিয়াছে। হযরত আবূ সুলায়মান (র) বলেন, "স্বপ্নদোষ শাস্তিস্বরূপ।" পরিতৃপ্ত ভোজনে স্বপ্নদোষ হইয়া থাকে। এই কারণেই ইহাকে শাস্তি বলা হইয়াছে।

সপ্তম উপকারিতা—ক্ষুধার ফলে মানুষের অবকাশকাল দীর্ঘ হয়। এই অবকাশকাল বিদ্যাভ্যাস ও অন্যান্য সৎকর্মে ব্যয় করা যাইতে পারে। যে ব্যক্তি অতিরিক্ত আহার করে তাহার পরমায়ুর অধিকাংশ সময় আহার, শয়ন, আহার্য-দ্রব্যাদি খরিদ ও উহার প্রস্তুত কার্যে অপচয় হইয়া থাকে। অতিরিক্ত ভোজনের দরুণ তাহাকে বহুবার পায়খানায় যাইতে হয়, শৌচপ্রক্ষালনাদি কার্যেও তাহার বহু সময় ব্যয় হয়। এইরূপে নানারূপ বেহুদা কার্যে তাহার জীবনের বিরাট অংশ অতিবাহিত হয়। মানুষের প্রতিটি নিশ্বাস এক একটি অমূল্য রত্ন এবং তাহার পরমায়ু একটি পরম সম্পদ। বেহুদা কার্যে ইহা ব্যয় করা নির্বুদ্ধিতার কার্য।

হযরত সররি সকতি (র) বলেন- "হযরত আলী জুরজানীকে যবের ছাতু পানিতে মিশাইয়া পান করিতে দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- 'আপনি রুটি আহার করেন না কেন?' তিনি উত্তরে বলিনে- 'ছাতুর শরবত পান করিতে যে সময়ের দরকার হয়, রুটি চর্বন করিয়া আহারে ইহা অপেক্ষা অধিক সময় ব্যয় হয়। এই অবকাশে সত্তর বার তসবীহ পড়া যায়। এইজন্য চল্লিশ বৎসর হইল আমি রুটি খাই না। রুটি চর্বণের জন্য বিরাট কল্যাণ হইতে বঞ্চিত থাকা আমি উচিত মনে করি না।"

ক্ষুধা সহ্য করিয়া যে ব্যক্তি অভ্যস্ত হইয়াছে, রোযা রাখা, ইতিকাফ অর্থাৎ দুনিয়ার সকল সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া নির্জন স্থানে আল্লাহ্‌র ইবাদতে লিপ্ত হওয়া এবং সর্বদা পাক-পবিত্র থাকা তাহার পক্ষে সহজ হইয়া পড়ে। পরকালের সওদাগরের পক্ষে এই লাভ নগণ্য নহে। হযরত আবূ সুলায়মান দারানী (র) বলেন, "উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিলে ছয়টি দোষ জন্মে- (১) ইবাদতের মাধুর্য পাওয়া যায় না; (২) জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রখরতা বিনষ্ট হয়; (৩) সৃষ্ট জীবের দুঃখ-দৈন্যে সমবেদনা লোপ পায়; কারণ, পরিতৃপ্ত ভোজনকারী মনে করে যে, সকলেই তাহার ন্যায় পানাহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছে; (৪) পাকস্থলী ভারী হইয়া ইবাদতে কষ্ট হয়; (৫) ভোগ-বিলাসের বাসনা বৃদ্ধ পায়; (৬) যে সময় অন্যান্য মুসলমান মসজিদে যাতায়াত করে, তখন পেটের দাসগণ পায়খানার দিকে দৌড়াদৌড়ি করে।

অষ্টম উপকারিতা—স্বল্পভোজীর স্বাস্থ্য ভাল থাকে। ঔষধের ব্যয়ভার বহন, চিকিৎসকের মানাভিমান ও রসিকতা এবং পীড়ার কষ্ট তাকে বরদাশত করিতে হয়

না। ফাস্‌দ উন্মোচন, সিঙ্গা লাগানো এবং তিক্ত ও স্বাদহীন ঔষধ ব্যবহারের যাতনাও তাহাকে সহ্য করিতে হয় না। জ্ঞানীগণ একমতে বলিয়াছেন– "অল্প ভোজন ব্যতীত এমন কোন বিষয় নাই যাহাতে নিরন্তর উপকার রহিয়াছে এবং কোন অপকারের লেশমাত্রও নাই।" হাদীস শরীফে আছে– "রোযা রাখ, তাহা হইলে তোমাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে।"

নবম উপকারিতা—যে ব্যক্তি কম খায় তাহার খরচও কম। এই জন্যই তাহার অধিক ধনের আবশ্যক হয় না। মানবের সকল বিপদাপদ, পাপ, হৃদয়ের অশান্তি অধিক ধনের আবশ্যকতা হইতে উদ্ভব হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রত্যহ অধিক পরিমাণে ভোজন করিতে চায়, ইহা যোগাড়ের উদ্বেগ ও চেষ্টায় তাহার সমস্ত দিন কাটিয়া যায়। ইহাও অসম্ভব নহে যে, সে লোভের বশবর্তী হইয়া অবৈধ ও সন্দেহজনক উপায়ে ধন লাভ করিবে। কোন একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াছেন– "আমার অভাব দেখা দিলে ইহা মোচনের জন্য অধিকাংশ স্থলে যে বিষয়ে আমি অভাব অনুভব করি, ইহা বর্জন করিয়া থাকি। ইহা আমার নিকট অতি সহজসাধ্য।" অপর একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন– "আমি কেন অপরের নিকট হইতে ধার চাহিব এবং স্বীয় উদরের নিকট হইতে ধার গ্রহণ করিব না? বরং ধারের আবশ্যক হইলে আমি উদরের নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়া থাকি এবং তাহাকে বলিয়া থাকি– "অমুক বস্তুর অভিলাষ বর্জন কর।" হযরত ইবরাহীম আদহাম (র) লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া যদি জানিতেন যে, কোন বস্তু দুর্মূল্য তবে তিনি তাহাদিগকে বলিতেন– "ইহা পরিত্যাগ করিয়া সুলভ কর।"

দশম উপকারিতা—ভোজন প্রবৃত্তি দমন করত উদর বশীভূত করিতে পারিলে মানুষ সদ্‌কা, বদাণ্যতা, পরোপকার, পরদুঃখ মোচন প্রভৃতি সৎকার্য করিতে সমর্থ হয়। অনুধাবন কর, যাহা উদরে প্রবেশ করে, ইহার অধিকাংশ বহির্গত হইয়াপায়খানায় পতিত হয় এবং যাহা সদ্‌কা ও দানে ব্যয়িত হয় উহা আল্লাহ্‌র করুণার হস্তে যাইয়া সঞ্চিত হয়। রাসূলে মাকবূল সল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম এক ভুঁড়িওয়ালা ব্যক্তিকে দেখিয়া বলেন– "যাহা তুমি উদরে ভর্তি করিতেছ, ইহা অন্যত্র ব্যয় করিলে (অর্থাৎ দান ও আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করিলে) উত্তম হইত।"

অল্পাহারের অভ্যাস সম্বন্ধে নিয়ম ও সাবধানতা—হালাল জীবিকা অর্জনের পর তিনটি বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা ধর্মপথ-যাত্রীদের অবশ্য কর্তব্য।

প্রথম কর্তব্য– অল্প ভোজন। উদর পূর্ণ করিয়া ভোজনে যাহারা অভ্যস্ত একেবারে অকস্মাৎ তাহাদের পক্ষে অল্প ভোজন সঙ্গত নহে। অন্যথা হিতের চেয়ে বরং অহিতের আশংকা রহিয়াছে। অতি ভোজনে অভ্যস্ত হইয়া অকস্মাৎ অল্পাহার করিলে যে শারীরিক কষ্ট হয়, ইহা সহ্য করাও দুঃসাধ্য। অতএব অতি ভোজনের অভ্যাস ক্রমশ হ্রাস করিতে হইবে। যে ব্যক্তি অভ্যাস হইতে একটি রুটি কম ভোজন করিতে চায়, সে প্রথমে এক গ্রাস কমাইবে, তৎপর দিন দুই গ্রাস, তৃতীয় দিন তিন গ্রাস কমাইবে। এইরূপে প্রত্যহ এক এক গ্রাস কমাইলে এক মাসে একটি রুটি কম হইবে এবং ইহা তাহার পক্ষে কঠিন হইবে না। তাহা হইলে দেহেরও কোন অনিষ্ট হইবে না এবং স্বাস্থ্যও ঠিক থাকিবে।

খাদ্যের পরিমাণ—স্বাস্থ্য রক্ষার উপযোগী ভোজনের পরিমাণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত।

প্রথম—সিদ্দীকগণ যে পরিমাণ ভোজনে অভ্যস্ত এবং ইহাই সর্বোত্তম নিয়ম। ইহা এই– যে পরিমাণ ভোজনে কেবল জীবনীশক্তি বজায় থাকে এবং যাহা হইতে কমাইলে প্রাণহানির আশঙ্কা হয়। হযরত সহল তস্তরী (র) এই পরিমাণই ভোজন করিতেন। তিনি বলেন– "প্রাণ, বুদ্ধি এবং ক্ষমতা এই তিনটি দ্বারা ইবাদতকার্য সম্পন্ন হয়। খাদ্যাভাবে এই তিনটির কোন একটি বিকৃত হওয়ার উপক্রম না হইলে ভোজন করা সঙ্গত নহে। অনাহারজনিত দুর্বলতার দরুন বসিয়া বসিয়া নামায পড়া, তৃপ্তির সহিত আহার করত দণ্ডায়মান হইয়া নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম। খাদ্যাভাবে প্রাণহানি বা বুদ্ধি লোপ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে ভোজন করা কর্তব্য, কারণ, বুদ্ধি ব্যতীত ইবাদত করা যায় না, আর প্রাণই ত মানবের মূলধন।" লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল– "আপনি কি নিয়মে ভোজন করিতেন?" তিনি বলিলেন– "তিন দেরেম মূল্যের খাদ্যে আমার সারা বৎসর চলিত। এক দেরেমের চাউলের আটা এক দেরেমের মধু এবং এক দেরেমের ঘৃত খরিদ করিয়া সমস্তগুলি একত্রে মিশাইয়া তিন শত ষাইটটি লাড্ডু প্রস্তুত করিতাম। প্রত্যহ ইফতারের পর একটি করিয়া লাড্ডু খাইতাম।" লোকে তাঁহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিল– "এখন কি ধরনে আহার করেন?" তিনি বলিলেন– "এখন কোনরূপ অভ্যাস নাই। পাইলে আহার করি, না পাইলে ধৈর্যাবলম্বন করিয়া থাকি– এখন আহার-অনাহার সমতুল্য।"

খৃষ্টান সাধুদের মধ্যে কেহ কেহ প্রত্যহ আটার মাযার অধিক খাদ্য গ্রহণ করেন না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ খাদ্যের পরিমাণ ক্রমশ ইহা অপেক্ষাও অধিক কমাইয়া থাকেন।

দ্বিতীয়—ইহাতে প্রায় চারি ছটাক ওজনের খাদ্যে দৈনিক আহার শেষ হয়। এই পরিমাণ খাদ্যে পূর্ণবয়স্ক একজন লোকের এক-তৃতীয়াংশ উদর পূর্ণ হইতে পারে। রাসূলে মাকবুল সল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

ثُلُثٌ لِلطَّعَامِ وَثُلُثٌ لِلشَّرَابِ وَثُلُثٌ لِلذِّكْرِ ـ

অর্থাৎ "উদরের এক-তৃতীয়াংশ খাদ্য দ্বারা ও এক-তৃতীয়াংশ পানি দ্বারা পূর্ণ করিবে এবং অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ যিকিরের জন্য খালি রাখিবে।" অন্য রেওয়ায়েতে উদরের এক-তৃতীয়াংশ নিশ্বাসের জন্য খালি রাখিতে বলা হইয়াছে। রাসূলে মাকবুল সল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বলেন– "কয়েক গ্রাস ভোজনই যথেষ্ট।" চারি ছটাক রুটিতে দশ গ্রাসের কম হইবে। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু সাত বা নয় গ্রাসের অধিক ভোজন করিতেন না।

তৃতীয়– ইহাতে দৈনিক প্রায় অর্ধসের ওজনের খাদ্যে ভোজন শেষ হয়। এই পরিমাণ ময়দার খামীর প্রস্তুত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাড্ডু তৈয়ার করিলে তিনটি লাড্ডু হইবে। প্রায় অর্ধসের রুটিতে সাধারণত পেটের এক-তৃতীয়াংশ পূর্ণ হইয়া ইহার অর্ধাংশ পর্যন্ত পূর্ণ হইতে পারে।

চতুর্থ– এই শ্রেণীর ভোজনের পরিমাণ দৈনিক অর্ধসেরের কিছু বেশী। কিন্তু ভোজনের পরিমাণ ইহার অধিক হইলেই ইহা অপচয়ের মধ্যে গণ্য হইবে। আল্লাহ্ এই অপচয় নিষেধ করিয়া বলেন ঃ

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ -

অর্থাৎ "আহার কর এবং পান কর, কিন্তু অপব্যয় করিও না। অবশ্যই আল্লাহ্ অপব্যয়কারীকে ভালবাসেন না।" (সূরা আ'রাফ, রুকু ৩. পারা ৮)

ভোজনের পরিমাণ নির্ধারণের নিয়ম—ভোজনের পরিমাণ নির্ধারণে সকলের জন্য একই নিয়ম প্রযোজ্য নহে। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে এবং শারীরিক পরিশ্রমের তারতম্যানুসারে ভোজনের পরিমাণেও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। তথাপি ইহার পরিমাণ সম্বন্ধে একটি সাধারণ নিয়ম নির্ধারণ করা যাইতে পারে। ইহা এই– "সর্বদা কিছু ক্ষুধা রাখিয়া ভোজন শেষ করিবে।" পূর্ববর্তী জ্ঞানীগণের অনেকে ভোজনের পরিমাণ সম্বন্ধে কোন নিয়ম নির্ধারিত করিয়া দেন নাই। কিন্তু তাঁহারা এই সাধারণ নিয়ম পালন করিয়া চলিতেন যে, ক্ষুধা প্রবল না হইলে তাঁহারা ভোজন করিতেন না এবং কিছু ক্ষুধা অবশিষ্ট থাকিতেই ভোজন হইতে বিরত হইতেন।

ক্ষুধার নিদর্শন—ক্ষুধা কাহাকে বলে তাহাও জ্ঞাত হওয়া উচিত। তরকারি ব্যতীত ভোজনের লালসা প্রবল হইয়া উঠিলে এবং খাদ্যদ্রব্য উৎকৃষ্ট কি নিকৃষ্ট, যবের কি বাজরার পার্থক্য করিবার অবকাশ না পাইলে বুঝিতে হইবে বাস্তবিক ক্ষুধা হইয়াছে। অন্নের সঙ্গে কিছু ব্যঞ্জন চাহিলে মনে করিবে প্রকৃত ক্ষুধা হয় নাই।

সাহাবা ও বুযুর্গগণের ভোজনের পরিমাণ—অধিকাংশ সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আন্হুমের দৈনিক ভোজনের পরিমাণ এক পোয়ার অধিক ছিল না। তন্মধ্যে কাহারও কাহারও আহারের পরিমাণ এব সপ্তাহে প্রায় সাড়ে তিন সের ছিল। তাঁহারা খোরমা ভক্ষণ করিলে এক সপ্তাহে প্রায় পাঁচ সের পরিমাণ আহার করিতেন। কারণ, ভক্ষণের সময় খোরমার বীচি ফেলিয়া দিতে হয়। হযরত আবূ যর রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন– "রাসূলে মাকবূল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবিতকালে এক শুক্রবার হইতে অপর শুক্রবার পর্যন্ত আমার আহার প্রায় সাড়ে তিন সের যবের আটা ছিল। আল্লাহ্র কসম, পরকালে তাঁহার নিকট গমনের পূর্বে আমি কখনও এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিব না।" রাসূলে মাকবূল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পরলোকগমনের পর কোন কোন ব্যক্তির ভোজন ও ও বসন-ভূষণে বিলাসিতার নিদর্শন লক্ষ্য করিয়া তিনি কখনও তাহাদিগকে ভৎসনা করিতেন, আবার কোন সময় আফসোস করিয়া বলিতেন– "হায়! হায়! তোমরা সেই উৎকৃষ্ট আচরণ পরিত্যাগ করিয়াছ!"

রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "সেই ব্যক্তি আমার পরম বন্ধু ও অন্তরঙ্গ যে অদ্য আমার জীবিতকালে যে প্রণালীতে আছে, সেই প্রণালীতেই পরলোকগমন করিতে পারে।" এই হাদীসের উল্লেখ করিয়া হযরত আবূ যর রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলিতেন– "হায়! তোমরা সেই উৎকৃষ্ট আচরণ পরিত্যাগ

করিয়াছ, যবের আটা বর্জন করত ময়দা সানাইতে আরম্ভ করিয়াছ; সরু সরু রুটি তৈয়ার করিতেছ; এক অন্নের সঙ্গে দুই রকমের তরকারি খাইতেছ; দিবারাত্রে পৃথক পৃথক পোশাক পরিধান করিতেছ। এইরূপ (বিলাসিতা) রাসূলে মাকবূল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় ছিল না। তখন প্রায় অর্ধসের খোরমা দ্বারা দুই জন সূফী ব্যক্তির আহার চলিত। ইহা হইতে আবার বীচি ফেলিয়া দেওয়া হইত।" হযরত সহল তস্তরী (র) বলেন– "নিখিল জগত রক্তময় হইলেও আমার খাদ্য তন্মধ্য হইতে হালালই হইবে।" ইহার মর্ম এই যে, নিতান্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত যেন মানুষ আহার না করে। কিন্তু এবাহতী সম্প্রদায় ইহার উদ্দেশ্য এই বুঝিয়া লইয়াছে যে, হারাম বস্তু অধিকার করিলেই হালাল হইয়া থাকে। এই ধারণা সত্য নহে। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হস্তে সদ্কার মাল হইতে একটি খোরমা গিয়াছিল; ইহাকেও তিনি হালাল বলিয়া গণ্য করেন নাই।

দ্বিতীয় কর্তব্য—ভোজনের সময়। ভোজনের পরিমাণের ন্যায় ইহার সময় সম্বন্ধেও সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। ভোজনের সময়ও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

প্রথম শ্রেণী—যাঁহারা তিনদিনের অধিক সময় পরে ভোজন করিয়া থাকেন তাঁহারা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এইরূপও ছিলেন যে, তাঁহারা এক সপ্তাহ, দশ দিন, বার দিন, এমন কি ইহার অধিক কালও অনাহারে অতিবাহিত করিয়াছেন। তাবিয়ীগণের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ শক্তি অর্জন করিয়াছিলেন যে, একাদিক্রমে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাঁহারা অনায়াসে অনাহারে কাটাইয়া দিতেন। হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্হু অধিকাংশ সময়ে ছয় দিন অন্তর ভোজন করিতেন। হযরত ইবরাহীম আদ্হাম (র) ও হযরত সাওরী (র) তিনদিন অন্তর ভোজন করিতেন। বুযুর্গগণ বলেন– " যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন অনাহারে থাকে, স্বর্গরাজ্যের অদ্ভুত বিষয়সমূহের কোন বস্তু অবশ্যই তাহার নিকট প্রকাশিত হইবে।"

জনৈক খৃষ্টান সাধুর সঙ্গে এক সূফীর বাদানুবাদ হইল। সূফী সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন– "তুমি প্রেরিত পুরুষ হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনয়ন কর না কেন?" সাধু বলিলেন– "আমাদের নবী হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম চল্লিশ দিন পর্যন্ত অনাহারে কাটাইতেন। সত্য নবী ব্যতীত কেহই এত দীর্ঘ সময় অনাহারে থাকিতে পারেন না। তোমাদের নবী ইহা করেন নাই।" সূফী বলিলেন– "তাঁহার উম্মতের মধ্যে আমি একজন নগণ্য গোলাম। আমি চল্লিশ দিন অনাহারে থাকিতে পারিলে তুমি ঈমান আনয়ন করিবে?" সাধু বলিলেন– "হাঁ, ঈমান আনিব।" তৎপর সূফী সেই স্থানে পঞ্চাশ দিন পানাহার ব্যতীত বসিয়া রহিলেন। ইহার পর তিনি সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন– "আরও কিছু দিন অনাহারে ধৈর্য ধারণ করিয়া কাটাইব কি?" সাধু বলিলেন– "হাঁ" সূফী তৎপর ষাট দিন অনাহারে পূর্ণ করিলেন। খৃষ্টান সাধূ ইহা দেখিয়া মুসলমান হইলেন।

তিনদিনের অধিককাল যাহারা অনাহারে যাপন করিতে সমর্থ তাহারা অত্যন্ত উন্নত মর্যাদার অধিকারী। চেষ্টা দ্বারা কেহই এত উচ্চ মর্যাদা লাভ করিতে পারে না। কিন্তু যাঁহার সম্মুখে এ জগতের পরপারের কোন কাজ উপস্থিত হইয়াছে, যাহাতে মগ্ন

হইলে স্বাস্থ্যও পালন হয় এবং তিনি নিজেও ইহাতে বিভোর হইয়া ক্ষুৎপিপাসা একেবারে ভুলিয়া যান, কেবল তেমন লোকই এত উন্নত সোপানে আরোহণ করিতে পারেন।

দ্বিতীয় শ্রেণী—এই শ্রেণীর লোক একাদিক্রমে দুই দিবস, তিন দিবস আহার না করিয়া অতিবাহিত করেন। ইহা সকলের পক্ষেই সম্ভবপর এবং অধিকাংশ দরবেশ ব্যক্তি এই নিয়মে ভোজন করিয়া থাকেন।

তৃতীয় শ্রেণী—এই শ্রেণীর লোকে প্রতিদিন একবার করিয়া ভোজন করে এবং ইহাই সর্বনিম্ন শ্রেণী। প্রত্যহ দুইবার ভোজন করিলে দ্বিতীয়বারের ভোজন অপচয়ের মধ্যে গণ্য হয়।[১] প্রত্যহ দুইবার আহার করা সঙ্গত নহে; প্রত্যহ দুইবার আহার করিলে ক্ষুধা কাহাকে বলে বুঝাই যায় না।

রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সকালে আহার করিলে বিকালে আহার করিতেন না; আবার বিকালে আহার করিলে সকালে আহার করিতেন না। তিনি হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হাকে সম্বোধন করিয়া বলেন– "খবরদার, কখনও অপব্যয় করিও না। দিনে দুইবার ভোজন করা অপব্যয়ের মধ্যে গণ্য।" যে ব্যক্তি দিবসে একবার ভোজন করিতে ইচ্ছা করে, তাহার পক্ষে প্রাতে ভোজন করা শ্রেয়ঃ। তাহা হইলে তাহাজ্জুদের সময় দেহটা হাল্কা মনে হয় এবং অন্তর নির্মল থাকে ও আনন্দ অনুভব হয়। কোন ব্যক্তি রাত্রে আহার করিতে ইচ্ছা করিলে দিবসে রোযা রাখিয়া ইফ্তারের সময় একটি রুটি এবং শেষ রাত্রে আর একটি রুটি গ্রহণ করিতে পারে।

তৃতীয় কর্তব্য—খাদ্যের প্রকার। গমের ছাঁকা আটা শ্রেষ্ঠ আহার্য বস্তু; যবের ছাঁকা আটা মধ্যম এবং ছাঁকা ব্যতীত যবের আটা নিকৃষ্ট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ব্যঞ্জনের মধ্যে গুশ্ত ও মিষ্টান্ন উৎকৃষ্ট; সিরকা ও লবণ অপকৃষ্ট শ্রেণীর অন্তর্গত এবং তেলে ভাজা রুটিকে মধ্যম শ্রেণীর খাদ্যদ্রব্য গণ্য করা হয়। পরকালের যাত্রীদের আচরণ এই যে, তাঁহারা অন্নের সহিত কোন তরকারি গ্রহণ করেন না এবং কোন বস্তু আহারের ইচ্ছা হইলে তাঁহারা উহা আহার করেন না। আর তাঁহারা বলেন-- "প্রবৃত্তি লালসার বস্তু পাইয়া পরিতৃপ্ত হইলে মনে অহমিকা, মোহ এবং অন্ধকার দেখা দেয়; সে তখন দুনিয়াতে দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিতে পছন্দ করে এবং মৃত্যুকে সে শত্রু বলিয়া মনে করে। সংসারকে সঙ্কীর্ণ ও অনুদার করিয়া লওয়া মানুষের উচিত; তাহা হইলে ইহাকে সে জেলখানাতুল্য মনে করিতে পারিবে এবং একমাত্র মৃত্যুবরণ যে সংসাররূপ জেলখানা হইতে পরিত্রাণের উপায় ইহা বুঝিতে সমর্থ হইবে। হাদীস শরীফে আছে– "আমার উম্মতের মধ্যে যাহারা মিহি আটা আহার করে তাহারা নিকৃষ্ট।" এই হাদীস

১. হযরত ইমাম গাযালী রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হির যমানায় লোকদের শারীরিক শক্তি বর্তমান যমানার লোকদের তুলনায় অনেক বেশী ছিল। বর্তমান যমানার লোকগণ অত্যন্ত দুর্বল। অধিক সময় অনাহারে থাকিলে তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট ও বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া বৃহত্তর ক্ষতির আশঙ্কা রহিয়াছে। এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া পরবর্তী যুগের মাশায়িখগণ ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় এই পরিমাণ আহার করিয়া ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকিবার উপদেশ দিয়া থাকেন। যাহাই হউক, পানাহার সম্বন্ধে কোন নিয়ম পালন করিবার পূর্বে খাঁটি পীর বা মুহাককেক আলিমের পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক। (অনুবাদক)

দ্বারা মিহি আটা হারাম করা হয় নাই। কোন কোন সময় ইহা আহার করা যাইতে পারে। কিন্তু সর্বদা আহার করিলে মনে উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজনের বাসনা প্রবল হইয়া উঠিবে এবং হৃদয় মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে।

রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "যাহারা ভোগ-বিলাসে লালিত-পালিত, যাহাদের দেহ ইহাতেই পরিপুষ্ট, যাহারা দিবা-রাত্র খাদ্যসামগ্রী ও সুন্দর বসন-ভূষণের চিন্তায় মগ্ন এবং যাহাদের মুখে কেবল বড় বড় উক্তি, তাহারা আমার উম্মতের মধ্যে নিকৃষ্ট।" হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের উপর ওহী অবতীর্ণ হইয়াছিল– "হে মূসা, জানিয়া রাখ, কবর তোমার বাসস্থান; অতএব বিলাসিতা হইতে তোমার শরীরকে বাঁচাও।" পার্থিব সম্পদ ও সুখ-স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইবার যাবতীয় বস্তু যাহার অর্জিত হইয়াছে এবং সকল বাসনাই যাহার পূর্ণ হইয়াছে, জ্ঞানীগণ তাহাকে সৌভাগ্যশালী বলিয়া গণ্য করেন না। হযরত ওহাব ইব্ন মুনাব্বেহ (র) বলেন– "চতুর্থ আসমানে দুইজন ফেরেশ্তার পরস্পর দেখা হইল। তাঁহাদের একজন বলিলেন– 'অমুক য়াহূদী অমুক মাছ খাইবার ইচ্ছা করিয়াছে, ধীবরের জালে মাছ আটকাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে আমি গমন করিতেছি।' অন্য ফেরেশ্তা বলিলেন– 'অমুক আবিদ ঘি আহারের ইচ্ছা করিয়াছেন জানিয়া এক ব্যক্তি এক পেয়ালা ঘি তাহার নিকট আনয়ন করিয়াছে, আমি ইহা ফেলিয়া দিবার জন্য যাইতেছি।" একদা এক ব্যক্তি ঠান্ডা পানিতে মধু মিশ্রিত করিয়া হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হুর হস্তে অর্পণ করিলেন। তিনি ইহা পান করিলেন না বরং প্রত্যাখ্যান করিয়া বলেন– "ইহার হিসাবের দায়িত্ব হইতে আমাকে দূরে রাখ।"

একবার পীড়িতাবস্থায় হযরত ইব্ন ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ভাজা মাছ খাওয়ার ইচ্ছা হইল। হযরত নাফে রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন– "মদীনা শরীফে মাছ তখন নিতান্ত দুর্লভ ছিল। অনেক পরিশ্রম ও অন্বেষণের পর দেড় দেরহেম মূল্যে একটি মাছ আমি কিনিয়া আনিলাম এবং ইহা ভাজিয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত করিলাম। এমন সময় একজন ফকীর তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন– 'লও, ইহা এই ফকীরকে প্রদান কর।' আমি বলিলাম– 'মাছ খাইবার আপনার ইচ্ছা হইয়াছে জানিয়া অনেক পরিশ্রমে আমি ইহা যোগাড় করিয়াছি। আপনি ইহা ভক্ষণ করুন। ইহার মূল্য আমি ফকীরকে দান করিতেছি।' তিনি বলিলেন– 'না, এই মাছই তাহাকে দান কর।' ফকীরকে আমি মাছটি দান করিলাম। কিন্তু তৎপর তাহার পশ্চাদানুসরণ করত মূল্য প্রদানে মাছটি আবার আমি খরিদ করিয়া আনিয়া হযরত ইব্ন ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হুর সম্মুখে পুনরায় উপস্থিতপূর্বক বলিলাম– 'আমি তাহাকে ইহার মূল্য দিয়াছি।' তিনি পূর্ববৎ বলিলেন– 'এই মাছটি তাহাকেই (ঐ ফকীরকে) দিয়া আস এবং ইহার মূল্যও ফিরাইয়া গ্রহণ করিও না।' তিনি আরও বলিলেন– 'আমি রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি– 'কোন দ্রব্য ভোজনের কাহারও ইচ্ছা হইলে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সে যদি ইহা ভোজনে বিরত থাকে, তবে আল্লাহ্ তাহার সমস্ত গোনাহ্ মাফ করিয়া দিয়া থাকেন।"

হযরত ওত্বাতুল গোলাম (র) আটার খামীর সূর্যের উত্তাপে শুকাইয়া ভোজন করিতেন; আগুনে ভাজিয়া রুটি তৈয়ার করিয়া খাইতেন না। রুটি যেন সুস্বাদূ না হয়,

এইজন্যই তিনি ইহা করিতেন। তিনি ঠান্ডা করিবার উদ্দেশ্যে পানি ছায়াতে রাখিতেন না, বরং গরম পানিই পান করিতেন। হযরত মালিক ইব্ন দীনারের (র) দুধ পানের প্রবল ইচ্ছা ছিল; কিন্তু চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তিনি দুধ পান করেন নাই। এক ব্যক্তি কতকগুলি খোরমা তাঁহার হস্তে অর্পণ করিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তিনি খোরমাগুলি হাতে রাখিলেন এবং পরিশেষে উহা সেই ব্যক্তিকে ফেরত দিয়া বলিলেন– "তুমিই উহা ভক্ষণ কর; কারণ, চল্লিশ বৎসর যাবত আমি খোরমা ভক্ষণ করি না।" হযরত আবূ সুলায়মান দারানীর (র) অন্যতম মুরীদ হযরত আহ্মদ ইব্ন হাওয়ারী (র) বলেন– "একদা আমার পীর লবণের সহিত গরম রুটি খাইতে চাহিলেন। আমি ইহা আনয়ন করিলাম। তিনি এক টুকরা রুটি মুখে দিবার উপক্রম করত ইহা রাখিয়া দিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন– 'হে খোদা, আমার অভিলষিত বস্তু তুমি আমার সম্মুখে স্থাপন করিয়া দিলে, ইহা আমার প্রতি শাস্তি স্বরূপ। আমি তওবা করিলাম, তুমি আমার গোনাহ্ মাফ কর।"

হযরত মালিক ইব্ন য়য়গাম (র) বলেন– "একদা বস্রার কোন বাজারের মধ্য দিয়া গমনের সময় এক প্রকার তরকারি দেখিয়া আমার ইহা খাইতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমি শপথ করিয়া বলিলাম যে, ইহা আমি ভক্ষণ করিব না। চল্লিশ বৎসর অতীত হইল; ধৈর্য ধারণ করিয়া ইহা ভোজনে নিবৃত্ত রহিয়াছি।" হযরত মালিক ইব্ন দীনার (র) বলেন– "পঞ্চাশ বৎসর হইল আমি সংসার ত্যাগ করিয়াছি; আমার দুগ্ধ পানের ইচ্ছা ছিল; কিন্তু আজ পর্যন্ত উহা পান করি নাই এবং যে পর্যন্ত আল্লাহ্র নিকট উপস্থিত না হইব, সেই পর্যন্ত পান করিব না।" হযরত হাম্মাদ ইব্ন আবূ হানীফ (র) বলেন– "একদা আমি হযরত দাউদ তায়ীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া শুনিতে পাইলাম গৃহাভ্যন্তর হইতে আওয়ায আসিতেছে– 'একবার তুই গাজরের অভিলাষ করিয়াছিলি, আমি তোর সেই অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছি; এখন তোর আবার খোরমার অভিলাষ হইয়াছে! ইহা কখনও তোকে ভক্ষণ করিতে দিব না।' তৎপর আমি ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তিনি ব্যতীত সেই স্থানে আর কেহই নাই। তখন আমি মনে করিলাম, তিনি নিজেকেই ঐরূপ তিরস্কার করিতেছিলেন।"

একদা হযরত ওত্বাতুল গোলাম (র) হযরত আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন যায়িদকে (র) বলিলেন– "অমুক ব্যক্তি তাহার অন্তরের অবস্থা আমাকে জানাইলেন। কখনও আমার তদ্রূপ অবস্থা হয় না।" হযরত আবদুল ওয়াহিদ (র) বলিলেন– "ইহার কারণ এই যে, সেই ব্যক্তি তরকারী ব্যতীত শুধু রুটি খাইয়া থাকেন এবং তুমি খোরমার সহিত রুটি খাইয়া থাক।" হযরত ওত্বাতুল গোলাম বলিলেন– "খোরমা না খাইলে কি আমার সেই অবস্থা হইবে?" তিনি বলিলেন– "হ্যাঁ।" সেইদিন হইতে হযরত ওত্বাতুল গোলাম (র) খোরমা খাওয়া পরিত্যাগ করিলেন। তৎপর একদিন তাঁহাকে রোদন করিতে দেখিয়া লোকে জিজ্ঞাসা করিল– "আপনি কি খোরমার জন্য রোদন করিতেছেন?" উত্তরে হযরত আবদুল ওয়াহিদ (র) বলিলেন– "তাঁহার প্রবৃত্তি খোরমা চাহিতেছিল, কিন্তু তাহার স্থির সঙ্কল্প হইতে সে জানিতে পারিয়াছে যে, সে কখনও ইহা খাইবে না। অতএব প্রবৃত্তি এখন হতাশ হইয়া কাঁদিতেছে।" হযরত আবূ বকর জালা (র) বলেন– 'এক ব্যক্তিকে আমি চিনি। তাঁহার কোন খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণের

ইচ্ছা হইয়াছিল; ইহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিনি দশ দিবস অনাহারে থাকিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁহাকে আমি বলিলাম– 'দশ দিবস অনাহারে থাকা অপেক্ষা প্রবৃত্তি যে পদার্থ চাহিয়াছিল ইহা চিরতরে পরিত্যাগ করাই উত্তম কাজ।" বুযুর্গ ও ধর্মপথ-যাত্রীদের কাজ এইরূপই হইয়া থাকে।

অভিলষিত খাদ্য বর্জনের উপায়—উপরিউক্ত উপায়ে কেহ যদি সকল বাঞ্ছিত বস্তুর লোভ সম্পূর্ণরূপে সংবরণ করিতে না পারে, তবে ইহাদের কতকগুলি সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়া অবশিষ্টগুলি ক্রমান্বয়ে বর্জনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে। তাহার কোন বস্তু খাওয়ার লালসা হইলে নিজে না খাইয়া ইহা অপরকে প্রদান করা উচিত। সর্বদা গুশ্ত ভক্ষণ করিবে না। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন,– "যে ব্যক্তি একাদিক্রমে চল্লিশ দিন গুশ্ত ভক্ষণ করে তাহার হৃদয় কঠোর হইয়া পড়ে এবং যে ব্যক্তি একাদিক্রমে চল্লিশ দিন গুশ্ত ভক্ষণ করে না তাহার স্বভাব মন্দ হয়।" হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহ্ আন্হু স্বীয় পুত্রকে আহার গ্রহণ সম্বন্ধে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই মধ্যপন্থা। তিনি তাঁহার পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলেন– "হে বৎস, এক বেলা গুশ্ত, এক বেলা রওগন তৈল, এক বেলা দুগ্ধ, এক বেলা সির্কার সহিত রুটি ভক্ষণ করিবে। আবার কোন কোন সময় ব্যঞ্জন ব্যতীত শুধু রুটিও ভোজন করিবে।"

ভোজনান্তে কর্তব্য—মুস্তাহাব নিয়ম এই যে, তৃপ্তির সহিত পানাহার করিয়া কখনও শয্যা গ্রহণ করিবে না। তাহা হইলে দ্বিবিধ মোহ তোমাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিবে। হাদীস শরীফে উক্ত হইয়াছে– "নামায ও যিকিরের জন্য ভোজন পরিত্যাগ কর এবং ভোজন করিয়া শয়ন করিও না। অন্যথা আত্মা মলিন হইয়া যাইবে।" বুযুর্গগণ বলিয়াছেন– "ভোজনান্তে চারি রাকআত নামায, একশত বার তাসবীহ বা কুরআন শরীফ হইতে কিছু অংশ পাঠ কর।"

হযরত সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আন্হু পরিতৃপ্ত ভোজন করিলে সারা রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া ইবাদত করিতেন এবং বলিতেন– "চতুষ্পদ জন্তুকে উদর পূর্ণ করিয়া আহার করাইলে তদ্দারা আয়াসসাধ্য কাজ করাইয়া লওয়া উচিত।" একজন বুযুর্গ স্বীয় মুরীদগণকে বলিতেন– "বাঞ্ছিত দ্রব্য আহার করিও না; আর যদি ইহা আহার কর, তবে ইহা অন্বেষণ করিও না; যদি ইহা অন্বেষণ কর, তবে ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইও না।"

ভোজন-লালসা দমনের কারণ—ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করিবার একমাত্র কারণ কু-প্রবৃত্তিসমূহের শক্তি হ্রাস করত ইহাদিগকে বশবর্তী ও মার্জিত করা। ইহারা সরল ও বশবর্তী হইয়া গেলে ভোজনের প্রকার, পরিমাণ ও সময় সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিপালনের আবশ্যকতা নাই। এই জন্য কামিল পীরগণ ভোজন সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী পালনের জন্য স্বীয় মুরীদগণকে আদেশ দিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা স্বয়ং এই সকল নিয়ম পালন করিয়া চলেন না। কারণ ক্ষুৎপিপাসার যন্ত্রণা ভোগ করা ভোজন-প্রবৃত্তি দমনের উদ্দেশ্য নহে; বরং ইহার প্রভাবে প্রবৃত্তিসমূহকে বশীভূত করাই মূল উদ্দেশ্য।

ক্ষুধা ও ভোজনের সামঞ্জস্য বিধান—এই পরিমাণ পানাহার করিবে যাহাতে পাকস্থলী পূর্ণ হইয়া দুর্বহ হইয়া না উঠে এবং ক্ষুৎপিপাসার যন্ত্রণাও ভোগ করিতে না

হয়। এই উভয় অবস্থাই অনিষ্টকর এবং ইবাদত হইতে মানুষকে বিরত রাখে। ফেরেশতাগণের গুণরাজি অর্জন করিতে পারিলেই মানুষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ফেরেশতাগণ ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করেন না; অপরপক্ষে ভোজনজনিত উদরের গুরুভারও তাঁহাদিগকে বহন করিতে হয় না। প্রথম হইতেই প্রবৃত্তির উপর জোর-জবরদস্তি করত ইহাকে দমন না করিলে মানুষ এইরূপ সাম্যভাব লাভ করিতে সমর্থ হয় না। কোন কোন বুযুর্গ নিজেকে অপূর্ণ মনে করত সর্বদা বিশেস সতর্কতার সহিত পথ চলিয়া থাকেন এবং বারবার স্বীয় প্রবৃত্তি নিরোধ করিয়া থাকেন ও ইহার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। আবার কোন কোন কামিল ব্যক্তি উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হইয়া সাম্যভাব লাভ করত স্থিতিশীল হন।

ফেরেশ্‌তাদের মত ক্ষুৎপিপাসা সম্বন্ধে সাম্যভাব লাভের অধিকার যে মানুষেরও আছে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামই ইহার উত্তম প্রমাণ। তিনি কখন কখন এমন নিরন্তর অনাহারে একাদিক্রমে রোযা রাখিতেন যে, লোকে মনে করিত তিনি আর কখনও ইফতার করিবেন না। আবার কোন কোন সময় তিনি এইরূপভাবে ভোজন করিতেন যে, লোকে ধারণা করিত তিনি আর কখনও রোযা রাখিবেন না। সাধারণতঃ ঘরে কোন আহার্য-সামগ্রী পাইলে তিনি সামান্য ভক্ষণ করিতেন, নতুবা অনাহারে রোযা রাখিতেন। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে তিনি মধু ও গুশ্‌ত বেশী পছন্দ করিতেন।

হযরত মা'রূফ কর্‌খীকে (র) কেহ কোন উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য ভোজন করিতে দিলে তিনি ইহা ভোজন করিতেন। কিন্তু হযরত বিশ্‌রে হাফীকে (র) কেহ কোন উৎকৃষ্ট বস্তু দিলে তিনি কখনও ইহা আহার করিতেন না। লোকে হযরত মা'রূফ কর্‌খীকে (র) ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন– "আমার ভ্রাতা বিশ্‌রে হাফী বৈরাগ্য ও পরহেজগারীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছেন, আর আমি মা'রূফ ইহা ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছি। 'আমি আল্লাহ্‌র গৃহে মেহ্‌মান, তিনি যাহা দান করেন তাহাই আহার করি। না দিলে ধৈর্যের সহিত অনাহারে থাকি। গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের কোন অধিকার আমার নাই।" এই কথাগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। যাহারা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করিতে অসমর্থ, এইরূপ নির্বোধগণই বৃথা গর্ব করিয়া বলিয়া থাকে–

"আমরা মা'রূফ কর্‌খীর (র) মত আরিফ ও আল্লাহ্‌র মেহ্‌মান।" কেবল দুই প্রকার লোকই রিয়াযত হইতে নিরস্ত থাকে– (১) সিদ্দীকগণ, যাঁহারা কঠোর সাধনায় ও যত্নে স্বীয় কর্ম যথাযথভাবে সম্পন্ন করিয়া লইয়াছেন এবং (২) যে নির্বোধ মনে করে– "সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন করিয়া লইয়াছি," অথচ কিছুই সম্পন্ন হয় নাই।

একমাত্র আল্লাহ্‌র শক্তি ব্যতীত অন্য কোন শক্তি হযরত মা'রূফ করখী (র) নিজের মধ্যে দেখিতে পাইতেন না; আমিত্ব বলিতে তাঁহার কিছুই ছিল না। তাঁহাকে কেহ আঘাত করিলে বা গালি দিলে তিনি রাগান্বিত হইতেন না। তিনি মনে করিতেন যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতেই তাঁহার প্রতি সেইরূপ আচরণ করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি এইরূপ উন্নত অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষেই তেমন উক্তি শোভা পাইয়া

থাকে। হযরত বিশরে হাফী, হযরত সরি সকতি, হযরত মালিক ইব্‌ন দীনার কাদ্দাসাল্লাহু সিররাহুম প্রমুখ মহাসাধক কামিল বুযুর্গগণও প্রবৃত্তির অনিষ্টকারিতা হইতে উদ্বেগশূন্য না হইয়া সর্বদা সাবধান থাকিতেন। এমতাবস্থায়, অপরের পক্ষে ঐরূপ উক্তি পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নহে। কি সাধ্য যে তাহারা হযরত মা'রূফ করখীর (র) মত অবস্থার দাবী করে?

পানাহার পরিত্যাগের আপদ—পানাহার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগের চেষ্টা করিলে ইহা হইতে দুইটি আপদ জাগিয়া উঠে। প্রথম– মানুষ পানাহার প্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না এবং তাহার গোপন রহস্য প্রকাশিত হউক, ইহাও সে পছন্দ করে না। এমতাবস্থায়, সে লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্জনে আহার করে এবং প্রকাশ্যে আহার করে না। ইহা জাজ্বল্যমান কপটতা এবং এই কপটতাই প্রথম আপদ। দ্বিতীয়– এইরূপও হইয়া থাকে যে, শয়তান আহার প্রবৃত্তি বিনাশকারীকে গর্বিত করিয়া তোলে এবং বলে– "ভোজনস্পৃহা বিনাশনে মহা উপকার নিহিত রহিয়াছে। ইহাতে লোক তোমার প্রতি অনুরক্ত হইয়া তোমার অনুকরণ করিবে এবং এইরূপে মুসলমান সমাজের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে।" তুমি শয়তানের এই প্রকার প্ররোচনায় উদ্বুদ্ধ হইলে প্রতারণা ও অহমিকা দোষে দুষ্ট হইবে। ইহাই দ্বিতীয় আপদ।

আহার-প্রবৃত্তি বিনাশকারীর আপদের প্রতিকার—আহার প্রবৃত্তি বিনাশকারী উল্লিখিত আপদদ্বয় হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে বাজার হইতে লোকের সম্মুখে লোভনীয় বস্তু খরিদ করা তাহার কর্তব্য। ইহা গৃহে আনয়ন করত স্বয়ং ভোজন না করিয়া লুক্কায়িতভাবে দীনদরিদ্রদিগকে দান করিয়া দিতে হইবে। ইহা অত্যন্ত বিশুদ্ধ সংকল্পের নিদর্শন এবং মহা সাধক সিদ্দীকগণ এইরূপ কার্য করিয়া থাকেন। কিন্তু এই কার্য নিতান্ত দুঃসাধ্য। ইহা প্রসন্নচিত্তে সহজভাবে করিতে পারিলে বুঝিতে হইবে, সংকল্প বিশুদ্ধ হইয়াছে। আর ইহাতে হৃদয়ের স্বাভাবিক আনন্দ ও প্রসন্নতার অভাব পরিলক্ষিত হইলে বুঝিবে, মনের গোপন কোণে এখনও রিয়া রহিয়াছে। অতএব আহার প্রবৃত্তি বিনাশকারীর হৃদয়ে রিয়া থাকিলে তাহাকে বাস্তবপক্ষে আল্লাহ্‌র আজ্ঞাধীন দাস বলা চলে না' বরং সে প্রবৃত্তিরই আজ্ঞাধীন দাস। আর যে ব্যক্তি আহার প্রবৃত্তি দমন করিতে যাইয়া রিয়ার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়, তাহাকে এমন ব্যক্তির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, যে বৃষ্টিতে ভিজিবার ভয়ে পানি নিকাশকারী পুতিগন্ধময় ময়লাযুক্ত নর্দমায় আশ্রয় গ্রহণ করে।

আহার-প্রবৃত্তি কর্তনের পর কাহারও হৃদয়ে উল্লিখিত আপদের সন্ধান মিলিলে লোকের সম্মুখে সামান্য ভক্ষণ করা তাহার উচিত। ইহাতে তাহার ক্ষুধাও নিবৃত্ত হইবে এবং রিয়া হইতেও অব্যাহতি লাভ করিবে।

কামরিপু

কামরিপুর আপদ—আল্লাহ্‌ মানব হৃদয়ে কামভাব এইজন্য চাপাইয়া দিয়াছেন যে, ইহার উত্তেজনায় সে স্ত্রী-পুরুষ সঙ্গমে বীজ বপন করিবে এবং ফলে মানব বংশ

বিলুপ্ত হইবে না। সম্ভোগকালে সে যেন স্বর্গীয় সুখ-আস্বাদের একটু নমুনা পায়, ইহাও কামভাব প্রদানের অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু কামরিপুর বশীভূত হইয়া গেলে মানুষকে বহুবিধ ভয়ংকর আপদে নিপতিত হইতে হয়।

একদা শয়তান হযরত মূসা আলায়হিস সালামকে সম্বোধন করিয়া বলিল– "নির্জনে কোন কামিনীর সঙ্গে কখনও বসিবে না; কারণ নির্জনে কোন কামিনীর সহিত উপবেশন করিলে আমি তাহাদের পিছনে এইরূপভাবে লাগিয়া যাই যে, অবশেষে তাহাদিগকে বিপদে না ফেলিয়া কখনও বিরত হই না।" হযরত সা'য়ীদ মুসায়েব (র) বলেন– "আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবীগণকে কামিনীর ফাঁদে আটকাইতে না পারিয়া শয়তান নিরাশ হইয়া রহিয়াছে। কামিনীর ফাঁদকে আমি যত ভয়াবহ মনে করি, আর কোন বিষয়কেই তত ভয়াবহ মনে করি না। এই কারণেই আমি স্বীয় গৃহ ও আমার পুত্রের গৃহ ব্যতীত অন্য কোন স্থানে যাই না।"

কামরিপুর অবস্থা—অবস্থা বিশেষে কামরিপু তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা ঃ (১) অত্যধিক, (২) অত্যল্প ও (৩) মধ্যম। কামভাব সীমা অতিক্রম করিয়া অনিয়মিতরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে মানুষ অশ্লীল ব্যভিচারকর্মে লজ্জা বোধ করে না এবং তখন ইহাতেই সে নিমজ্জিত হইয়া থাকে। কামপ্রবৃত্তি এইরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে ইহার শক্তি হ্রাস করিবার নিমিত্ত বরাবর রোযা রাখা অবশ্য কর্তব্য। ইহাতেও কামরিপুর উত্তেজনা হ্রাসপ্রাপ্ত না হইলে বিবাহ করা আবশ্যক। কামভাব একেবারে জাগরিত না হওয়াও অনিষ্টকর। আর কামভাবের মধ্যম অবস্থা এই যে, যদি হৃদয়ে কামভাব জাগরিত হয়, তবে ইহা মানবের বশীভূত থাকে।

অবস্থাবিশেষে কামবর্ধক দ্রব্য ব্যবহারের অনুমতি—কামপ্রবৃত্তি বাড়াইবার উদ্দেশ্যে কেহ কেহ ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকে, ইহা অত্যন্ত নির্বোধের কাজ। ভীমরুলের বাসায় খোঁচা দেওয়ার সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে। কেহ ভীমরুলের বাসায় খোঁজা দিলে ভীমরুল তাহাকে দংশন না করিয়া নিরস্ত হয় না। তদ্রূপ কামপ্রবৃত্তিকেও উত্তেজিত করিবার জন্য কেহ ঔষুধ ব্যবহার করিলে ইহাও তাহার দুর্গতি না ঘটাইয়া নিরস্ত থাকে না। কিন্তু যে ব্যক্তি একাধিক বিবাহ করিয়াছে, তাহার স্ত্রীদের যথাযথ হক আদায় ও তাহাদিগকে যত্নের সহিত রক্ষার উদ্দেশ্যে বীর্যবর্ধক ঔষধ ব্যবহার ও পুষ্টিকর আহার তাহার পক্ষে নিন্দনীয় নহে, কারণ, স্বামী পত্নীদের দুর্গস্বরূপ যাহাতে তাহারা আশ্রয় লইয়াছে।

'গারায়িবুল আখ্‌বার' কিতাবে বর্ণিত আছে, রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একবার কামভাবের দুর্বলতা অনুভব করেন। এমতাবস্থায়, হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালাম তাঁহাকে 'হারিসা' খাইতে বলেন। কারণ তাঁহার নয় জন স্ত্রী ছিলেন, দুনিয়ার সকল লোকের সহিত তাঁহাদের বিবাহ হারাম ছিল এবং নিখিল বিশ্ব হইতে তাঁহাদের কামনা বিচ্ছিন্ন ও বিলুপ্ত ছিল।

প্রেমাসক্তি—কামপ্রবৃত্তির আপদসমূহের অন্যতম বড় আপদ প্রেমাসক্তি। ইহা বহুবিধ পাপের মূল কারণ। যৌবনের প্রথম হইতেই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না

করিলে প্রেমাসক্ত হইয়া মানুষ পাপসমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া যাইতে পারে। চক্ষুকে সংযত ও শাসনে রাখাই সতর্কতা অবলম্বনের উত্তম ব্যবস্থা।

কামিনীর প্রতি সংযমহীন দৃষ্টিপাতের আপদ—অকস্মাৎ কোন কামিনী দৃষ্টিগোচর হইলে তৎক্ষণাত তাহার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে হইবে এবং এইরূপে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে যেন পুনর্বার তৎপ্রতি দৃষ্টি পতিত না হয়। এইরূপে প্রথম হইতেই চক্ষুকে সংযত ও শাসনে রাখা সহজসাধ্য। কিন্তু প্রথমে স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দিয়া পরিশেষে ইহাকে বশীভূত করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। এই বিষয়ে প্রবৃত্তিকে চতুষ্পদ জন্তুর সঙ্গে তুলনা করা চলে। পশুর গতি পরিবর্তন করিতে চাহিলে প্রথমেই ইহার লাগাম ধরিয়া আকর্ষণ করিলে ইহা সহজসাধ্য হয়। কিন্তু হস্ত হইতে লাগাম পরিত্যাগ করিয়া পরে ইহার লেজ ধরিয়া আকর্ষণ করিলে কোন লাভ হয় না; লেজ ধরিয়া ইহার গতি ফিরানো দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। মোটের উপর চক্ষুকে সংযত ও শাসনে রাখাই মূল উদ্দেশ্য।

হযরত সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র (র) বলেন– "হযরত দাউদ আলায়হিস্‌সালাম চক্ষুর দরুনই বিপদে পতিত হইয়াছিলেন।" হযরত দাউদ আলায়হিস্ সালাম স্বীয় পুত্রকে নসীহত করিয়াছিলেন– "বাঘ ও অজগরের পিছনে গমন করা বরং শ্রেয়ঃ, কিন্তু তবুও রমণীর পিছনে ধাবিত হওয়া কখনই সঙ্গত নহে।" হযরত ইয়াহ্‌ইয়া আলায়হিস্ সালামকে লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল– "ব্যভিচার কোথা হইতে জন্মে?" তিনি বলিলেন– "চক্ষু হইতে।" রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "শয়তানের বিষাক্ত তীরসমূহের মধ্যে (অসংযত) দৃষ্টি একটি বিষময় তীর। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হইয়া স্বীয় চক্ষুকে সংযত ও শাসনে রাখে, আল্লাহ্ তাহাকে এইরূপ ঈমান দান করেন যাহার মাধুর্য সে আপন অন্তরে অনুভব করে।" তিনি বলেন– "আমার পরলোকগমনের পর আমার উম্মতের জন্য রমণীর ন্যায় এত কঠিন বিপদ আর কিছুই থাকিবে না।" তিনি অন্যত্র বলেন– "গুপ্তাঙ্গের মত চক্ষুও যিনা করে।" কামভাব সহকারে দৃষ্টিপাতই চক্ষের যিনা। যে ব্যক্তি চক্ষুকে সংযত রাখিতে পারে না, অনতিবিলম্বে ইহা দমনের উপায় অবলম্বন করা তাহার অবশ্য কর্তব্য। কঠোর সাধনা ও রোযা দ্বারা কামপ্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত ও সংযত করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা কার্যকরী না হইলে বিবাহ করিয়া হালাল উপায়ে স্ত্রী-সম্ভোগ করত দুর্দমনীয় কামরিপু দমন করিতে হইবে।

বালকদের প্রতি কটাক্ষ দৃষ্টির আপদ—রমনীয় অজাতশ্মশ্রু কিশোর বালকের প্রতি কটাক্ষ দৃষ্টিপাতেও ভীষণ বিপদের আশংকা রহিয়াছে। কিশোর বালকের প্রতি কটাক্ষ দৃষ্টিপাত কখনও জায়েয হইতে পারে না। কামভাবের তাড়নায় কিশোর বালকের প্রতি দৃষ্টিপাত করা অবৈধ। কিন্তু সবুজ বৃক্ষলতাদি পরিপূর্ণ বিস্তীর্ণ মাঠ, নানা বর্ণ ও গন্ধের ফুল ও কলিকা এবং সুরম্য কারুকার্য দেখিলে যেরূপ সুখ অনুভূত হয়, কিশোর বালকের সুন্দর মূর্তি দর্শনেও যদি মনে তদ্রূপ আনন্দ অনুভূত হয়, তাহা হইলে ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। তবে ইহা তখনই দোষহীন বলিয়া গণ্য হইবে যখন

দর্শকের হৃদয় সেই বালকের সঙ্গলাভের জন্য উৎসুক না হইয়া উঠে; কেননা ফুল, কলিকা ও সবুজ তৃণক্ষেত্র যতই রমণীয় হউক না কেন, দর্শক উহাদিগকে স্পর্শ ও চুম্বনাদি করিতে লালায়িত হয় না, বরং উহা দেখিয়াই আনন্দ লাভ করে। সুন্দর বালক দেখিলে যদি কেহ তাহার সঙ্গলাভের জন্য উৎসুক হইয়া উঠে, তবে ইহাকে কামপ্রবৃত্তি বলিয়া মনে করিবে এবং ইহাই পুরুষ সম্ভোগরূপ জঘন্য ব্যভিচারের প্রথম ধাপ।

একজন কামিল পীর বলেন- "কোন সুন্দর কিশোর বালকের সহিত আমার কোন মুরীদের সাক্ষাত ঘটিলে আমি যেরূপ ভীত হই, ভীষণ ক্রুদ্ধ বাঘ লাফাইয়া পতিত হইলেও আমি তত ভয় করি না।"

কামপ্রবৃত্তি দমনের উপায়—জনৈক ধর্মপথ-যাত্রী বলেন- "একদা আমার হৃদয়ে কামভাব এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, ইহার উত্তেজনায় আমি অধীর হইয়া খুব ক্রন্দন করিলাম এবং ইহা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট অনেক প্রার্থনা করিলাম। রাত্রে স্বপ্নে একজন বুযুর্গকে দেখিতে পাইলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- তোমার কি হইয়াছে?' আমি তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলাম। তিনি আমার বক্ষে হাত বুলাইয়া দিলেন। আমি জাগ্রত হইয়া দেখিলাম, আমার কামপ্রবৃত্তি শান্ত ও সংযত হইয়াছে! এক বৎসর কাটিয়া গেলে আবার কামভাব প্রবল হইয়া উঠিল। আমি আবার রোদন করিয়া কামভাব দমনের জন্য নিবেদন করিলাম। স্বপ্নে পুনরায় সেই বুযুর্গকে দেখিতে পাইলাম। তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন- 'তুমি কি চাও যে, আমার মধ্যস্থতায় তোমার কামভাব দমন হউক?' আমি বলিলাম- 'হাঁ।' তিনি আমাকে মাথা নোয়াইতে বলিলেন। আমি তাহাই করিলাম। তৎপর তিনি তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া আমার গ্রীবাদেশে প্রহার করিলেন। জাগ্রত হইয়া দেখিলাম আমার কামভাব শান্ত হইয়াছে। বৎসরান্তে আবার কামপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া উঠিল। আমি আবার পূর্ববৎ রোদন করিয়া প্রার্থনা করিলাম এবং স্বপ্নে সেই বুযুর্গের সাক্ষাত লাভ করিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন- 'অন্তর হইতে যাহার উৎপাটন আল্লাহ্ পছন্দ করেন না, ইহার উচ্ছেদের জন্য কতবার প্রার্থনা করিবে?' তৎক্ষণাত আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তৎপর আমি বিবাহ করিয়া কামপ্রবৃত্তি হইতে মুক্তি লাভ করিলাম।"

কামরিপুর বিরুদ্ধাচরণে সওয়াব—রিপু যত অধিক বলবান হইবে, ইহার বিরুদ্ধাচরণে তত অধিক সওয়াব মিলিবে। কামভাবের ন্যায় এত বলবান কোন রিপু মানুষের আর নাই। তদুপরি ইহা তাহাকে অতি হীন কাজে উদ্বুদ্ধ করে।

যাহারা প্রবল তাড়না সত্ত্বেও কামভাব চরিতার্থ করে না, তাহারা সকলেই যে আল্লাহ্‌র ভয়ে এই হীন কাজ হইতে বিরত থাকে তাহা নহে; বরং অধিকাংশ লোকই সুযোগের অভাব, অক্ষমতা ও লোকলজ্জার ভয়ে নিরস্ত থাকে। লোকলজ্জার ভয় এই যে, ব্যভিচার প্রকাশ হইলে বদনাম রটিবে। যাহারা এই ত্রিবিধ কারণে কামরিপু দমন করে, তাহারা কোনই সওয়াব পাইবে না। কেননা, কেবল সাংসারিক স্বার্থের

অনুরোধে তাহারা এইরূপ কুৎসিত কর্ম হইতে নিরস্ত থাকে, শরীয়তের নির্ধারিত সীমা অতিক্রমের ভয়ে নহে। তবে যে কোন কারণেই হউক, গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকাও পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

যাহার কামরিপু চরিতার্থ করিবার সম্পূর্ণ শক্তি ও সুবিধা আছে এবং ইহা সমাধানের পথে কোন বাধাবিঘ্ন নাই, কিন্তু একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সে গোনাহ্ হইতে নিরস্ত থাকে, সে মহা সওয়াব পাইবে। এই প্রকার ব্যক্তি ঐ সাত শ্রেণীর লোকের অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহারা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র আরশের ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করিবে। তদুপরি কামভাব দমন ব্যাপারে সেই ব্যক্তি হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামের তুল্য মর্যাদা লাভ করিবে। কেননা তিনি কামরিপু বিজয়ীদের একচ্ছত্র অগ্রগামী নেতা।

রমণী-প্রলোভন সংবরণের উপাখ্যান—(১) হযরত সুলায়মান ইব্‌নে বাশার অত্যন্ত সুন্দর পুরুষ ছিলেন। এক পরমা সুন্দরী যুবতী স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহার নিকট আত্ম-বিক্রয় করিতে চাহিল, কিন্তু তিনি তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে তথা হইতে পলায়ন করিলেন। তিনি বলেন, সেই রাত্রে স্বপ্নে তাঁহার সহিত হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সাল্লামের সাক্ষাত ঘটে। তাঁহাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- "আপনি কি হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম?" তিনি বলিলেন- "হাঁ; আমি সেই ইউসুফ যাহার ইচ্ছা হইয়াছিল; কিন্তু তুমি সেই সুলায়মান যাহার ইচ্ছাও হয় নাই।" এই উক্তিতে কুরআন শরীফের এই আয়াতের প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا অর্থাৎ 'অবশ্য সেই রমণী (যুলায়খা) ইচ্ছা করিয়াছিল তাঁহার (হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামের) দিকে এবং তিনিও (হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম) অভিলাষ করিয়াছিলেন সেই রমণীর (যুলায়খার) দিকে।

(২) হযরত সুলায়মান ইব্‌নে বাশার (র) হইতে আরও একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। তিনি বলেন- "আমি হজ্জের উদ্দেশে বহির্গত হইয়াছিলাম। মদীনা শরীফ অতিক্রম করিয়া 'আইওয়া' নামক স্থানে উপনীত হইলে কিছু খাদ্যসামগ্রী খরিদ করিবার জন্য আমার সাথী দূরে চলিয়া গেলেন। এমন সময় আরব বংশীয় এক পরমা রূপবতী রমণী নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র তুল্য মুখমণ্ডল হইতে ঘোমটা উন্মুক্ত করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল এবং আবেগপূর্ণ দুইটি কবিতা আবৃত্তি করিল। কবিতার মর্মে আমি বুঝিলাম প্রবল ক্ষুধা তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে এবং সে কিছু আহার্য সামগ্রী প্রার্থনা করিতেছে। আমি তাহাকে খাদ্যদ্রব্য দিতে চাহিলাম; কিন্তু সে স্পষ্টভাবে বলিল যে, সে ইহা প্রার্থনা করে নাই, বরং যুবকের নিকট যুবতীর যে সম্ভোগ ইহার জন্যই সে লালায়িত। ইহা শ্রবণে আমি অবনত মস্তকে অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলাম। আমার অবস্থা দেখিয়া সেই যুবতীর কাম-বাসনা অপসারিত হইল এবং তাহার মুখমণ্ডল ঘোমটা দ্বারা আবৃত করত সে স্বীয় গন্তব্যস্থানে যাত্রা করিল।

"এমন সময় আমার সাথী খাদ্য সামগ্রী লইয়া প্রত্যাবর্তন করত আমার

মুখমণ্ডলে রোদনের লক্ষণ দেখিতে পাইলেন এবং ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, গৃহে স্ত্রী-পুত্র রাখিয়া আসিয়াছি, তাহাদের বিরহ যাতনায় রোদন করিলাম। আমার সাথী বলিলেন- "যাঁহার হৃদয় পার্থিব মায়া-মমতার ঊর্ধ্বে, স্ত্রী-পুত্রের বিরহ তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে, ইহা কখনও হইতে পারে না; অবশ্য অপর কোন ব্যাপার হইয়াছে।' যাহা হউক, বহু অনুনয়-বিনয়ের পর আমি তাঁহাকে প্রকৃত ঘটনা আনুপূর্বক শুনাইলাম। ইহা শুনিয়া আমার সাথীও রোদন করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, তাঁহাকে ঐরূপ প্রলুব্ধ করিলে তিনি কখনও লোভ সংবরণ করিতে পারিতেন না, এইজন্যই তিনি রোদন করিতেছেন।

"সে যাহাই হউক, আমরা মক্কা শরীফে উপনীত হইয়া তওয়াফ ও হজ্জের অন্যান্য ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিলাম। তৎপর এক প্রকোষ্টে আমি নিদ্রিত হইলে স্বপ্নযোগে উন্নত দেহ, প্রশস্ত ললাট, প্রশান্ত মূর্তি, চন্দ্রবদন বিশিষ্ট, পরম রমণীয় গৌরবর্ণ এক ব্যক্তির দর্শন লাভ করিলাম। তাঁহার পরিচয় জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন- 'আমার নাম ইউসুফ।' আমি বলিলাম- 'আপনি ইউসুফ সিদ্দীক?' তিনি বলিলেন- 'হাঁ।' আমি বলিলাম- আযীযের স্ত্রী সম্পর্কে আপনার কাহিনী অত্যন্ত অদ্ভুত ও অলৌকিক।' তিনি বলিলেন- 'আরব বংশীয়া যুবতী সম্পর্কে তোমার উপাখ্যান ইহা অপেক্ষা অধিক অদ্ভুত ও অলৌকিক।"

(৩) হযরত ইব্নে ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "অতীতকালে তিনজন লোক দেশ পর্যটনে বাহির হন। রজনী আগমনে নিরাপদ হইবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা এক পর্বতের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। হঠাৎ একটি প্রস্তর পর্বতশিখর হইতে ঐ গুহার মুখে এইরূপে পতিত হইল যে, গুহার ভিতর হইতে বাহির হইবার আর কোন পথ রহিল না। (প্রস্তরখণ্ড এত ভারী ছিল যে,) তাঁহারা ইহা নড়াইতেও অসমর্থ ছিলেন। নিতান্ত অসহায় এই তিনজন লোক (প্রাণ বাঁচাইবার কোন উপায় না দেখিয়া) পরস্পর পরামর্শ করত স্থির করিলেন- 'চল, আমরা তিনজনে নিজ নিজ সৎকর্মের নাম উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করি, ইহাতে হয়ত তিনি আমাদিগকে এই বিপদ হইতে অব্যাহতি দিতে পারেন।"

"তাঁহাদের একজন নিবেদন করিলেন- 'হে খোদা, তুমি অবগত আছ, আমার মাতাপিতা ছিলেন। তাঁহাদিগকে ভোজন না করাইয়া আমি কখনও ভোজন করি নাই এবং আমার স্ত্রী-পুত্রদিগকেও আহার প্রদান করি নাই। একদা কোন কার্য উপলক্ষে আমি কিছু দূরে গিয়াছিলাম। গভীর রাত্রে আমি তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিলাম, আমার মাতাপিতা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছেন। আমি এক পেয়ালা দুধ লইয়া আসিয়াছিলাম। ইহা হস্তে ধারণপূর্বক তাঁহাদের নিদ্রা ভঙ্গের প্রতীক্ষায় শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার সন্তানগণ ক্ষুধার যন্ত্রণায় অত্যন্ত রোদন করিতেছিল।

আমি তাহাদিগকে বলিলাম- 'আমার মাতাপিতা পান করিবার পূর্বে তোমাদিগকে কিছুতেই দিব না।' আমার মাতাপিতা প্রভাতকাল পর্যন্ত নিদ্রিত রহিলেন। আমি দুগ্ধের পেয়ালা হাতে লইয়া সারা রাত্রি দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার সন্তানগণ ও আমরা স্বামী-স্ত্রী সকলেই ক্ষুধিত ছিলাম। হে খোদা, যদি তুমি জান যে, কেবল তোমার সন্তোষ অর্জনের জন্যই আমি ঐ কার্য করিয়াছিলাম, তবে আমাদের এই বিপদ দূর কর।' এই ব্যক্তির প্রার্থনার ফলে প্রস্তরখণ্ড সরিয়া একটু ফাঁক হইল, কিন্তু মানুষ বাহির হইয়া আসিতে পারে, ইহা এত প্রশস্ত হইল না।

"তৎপর দ্বিতীয় ব্যক্তি নিবেদন করিলেন- 'হে খোদা, তুমি অন্তর্যামী তুমি জান, আমার চাচার এক কন্যা ছিল। আমি তাহার প্রতি আশিক ছিলাম। সে আমার কথা মানিত না। এমন সময় এক বৎসর ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ইহাতে নিঃসহায় হইয়া সে আমার প্রতি হাসি-তামাসা করিতে লাগিল। আমি যাহা বলিব, সে তাহাই করিবে, এই অঙ্গীকারে আমি তাহাকে একশত বিশটি স্বর্ণমুদ্রা দিলাম। মোটের উপর আমি যখন অপকর্মের নিকটবর্তী হইলাম তখন সে বলিল- 'তুমি ভয় কর না? আল্লাহ্র মোহর তাঁহার আদেশ ব্যতীত উন্মুক্ত করিতে যাইতেছ?" আমি ভীত হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। নিখিল বিশ্বে সেই যুবতীর ন্যায় আমার নিকট লোভনীয় আর কিছুই ছিল না, তথাপি আর কখনও আমি তাহার কামনা করি নাই। হে খোদা, তুমি যদি জান যে, কেবল তোমার প্রসন্নতা লাভের জন্যই আমি ঐরূপ করিয়াছি, তাহা হইলে এই বিপদ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর।' পুনরায় প্রস্তরখণ্ড আরও একটু নড়িয়া গেলে গুহার মুখ পূর্বাপেক্ষা বড় হইল, কিন্তু (সেই পথ) মানুষ বাহির হইবার উপযোগী হইল না।

"পরিশেষে তৃতীয় ব্যক্তি এইরূপ নিবেদন করিতে লাগিলেন-'হে খোদা, তুমি জান। একবার আমি কয়েকজন শ্রমিক-মজুর কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। সকলকেই তাহাদের বেতন দিয়াছিলাম, কিন্তু একজন তাহার বেতন না লইয়াই চলিয়া গেল। তাহার বেতন দিয়া একটি ছাগল খরিদ করত তদ্দ্বারা আমি ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিলাম। ইহাতে অনেক ধন জমা হইল। একদা সেই মজুর তাহার বেতন নিতে আসিল। তখন গাভী, বলদ, উট, ছাগল, দাস-দাসী ইত্যাদি বহু সামগ্রী ঐ কারবারে সঞ্চিত হইয়াছিল। আমি তাহাকে বলিলাম-'এই সমস্তই তোমার বেতন (তুমি এই সমস্ত লইয়া যাও)।' সে বলিল- 'আপনি আমার সহিত ঠাট্টা করিতেছেন?' আমি বলিলাম-'না, ঠাট্টা নয়; বাস্তবিকই এই সমস্ত তোমার বেতন হইতে সঞ্চিত হইয়াছে।' এই কথা বলিয়া সকল ধন-সম্পদ তাহাকে দিয়া দিলাম; উহা হইতে আমি এক কপর্দকও গ্রহণ করিলাম না। হে খোদা, তুমি যদি অবগত থাক যে, শুধু তোমার সন্তোষ লাভের জন্যই আমি ঐ কার্য করিয়াছি, তবে আমাদের এই বিপদ দূর কর।' প্রস্তরখণ্ড তৎক্ষণাত সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হইল, রাস্তা উন্মুক্ত হইল, তাঁহারা বাহির হইয়া আসিলেন এবং বিপদ দূর হইল।"

(৪) হযরত করব ইব্নে আবদুল্লাহ মুযানী (র) বলেন- "এক কসাই তাহার প্রতিবেশীর এক দাসীর প্রতি আশিক ছিল। একদা সেই দাসী কোন কার্য উপলক্ষে এক জনশূন্য পার্বত্য-পথে গমন করিতেছিল দেখিয়া গোপনে সেই কসাই তাহার পশ্চাতে লাগিল এবং সুযোগ বুঝিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। দাসী তখন তাহাকে বলিল- 'হে যুবক, তুমি আমাকে যেরূপ ভালবাস, আমি তোমাকে ইহা অপেক্ষা অধিক ভালবাসি। কিন্তু কি করিব, আমি যে আল্লাহ্কে ভয় করি।' ইহা শুনিয়া কসাইর চৈতন্যোদয় হইল এবং বলিল- 'হে সাধ্বী, তুমি যখন আল্লাহ্কে ভয় কর, তখন আমি কিরূপে তাঁহাকে ভয় করিব না?' ইহা বলিয়া সে তওবা করিল এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিল। পথে তাহার প্রবল তৃষ্ণা হইল, এমনকি ইহাতে তাহার প্রাণহানির উপক্রম হইল। এমন সময় তদানীন্তনকালের পয়গম্বর কর্তৃক প্রেরিত একজন লোক আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি কসাইর ব্যাকুল অবস্থা দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- 'তুমি কি আপদের সম্মুখীন হইয়াছ?' কসাই বলিল- 'প্রবল তৃষ্ণা আমাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে।' ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন- 'এস, আমরা উভয়ে আল্লাহ্র নিকট মেঘের জন্য প্রার্থনা করি, যেন শহরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত মেঘ আমাদের উপর ছায়া দান করিতে থাকে।' কসাই বলিল- 'আমার কোন সৎকর্ম নাই যাহাতে আমার প্রার্থনা গৃহীত হইতে পারে। আপনি প্রার্থনা করুন, আমি 'আমীন' (তাহাই হউক) বলিব।'

"যাহাই হউক, কসাইর কথানুযায়ী প্রার্থনা করা হইল। ফলে মেঘ আসিয়া তাঁহাদের উপর ছায়া বিস্তার করিয়া সাথে সাথে চলিতে লাগিল। যখন তাহারা পরস্পর পৃথক হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরিলেন, তখন মেঘটি কসাইর উপর ছায়া প্রদান করিতে করিতে চলিতে লাগিল এবং পয়গম্বরের প্রেরিত ব্যক্তি প্রখর রৌদ্রে চলিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া তিনি কসাইকে বলিলেন- 'হে যুবক, তুমি ত বলিয়াছিলে, তোমার কোন সৎকর্ম নাই, এখন দেখিতেছি মেঘ কেবল তোমাকে ছায়া দানের জন্যই আগমন করিয়াছে। তোমার প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা কর।' কসাই বলিল- 'এক দাসীর কথায় আমি আজ অপকর্ম হইতে তওবা করিয়াছি, এতদ্ব্যতীত আমি আর কিছুই জানি না।' ঐ ব্যক্তি বলিলেন-'তাহাই হইবে। কারণ আল্লাহ্র নিকট তওবাকারীর প্রার্থনা যেরূপ কবূল হইয়া থাকে, আর কাহারও প্রার্থনা তদ্রূপ কবূল হয় না।"

রমণীর প্রতি কটাক্ষ দৃষ্টি ও ইহার আপদ—যে কাজ করিবার ক্ষমতা মানুষের আছে, অথচ ইহা হইতে সে নিজেকে বিরত রাখে, এমন উদাহারণ জগতে নিতান্ত বিরল। অতএব যে কারণে মানুষ প্রথমত গর্হিত কার্যে প্রবৃত্ত হয়, ইহা দমন করাই তাহার পক্ষে উত্তম ব্যবস্থা। মানুষ যে কামরিপুর তাড়নায় উত্তেজিত হইয়া কুকর্মে প্রবৃত্ত হয়, চক্ষুই ইহার আদি কারণ।

হযরত আলী ইব্নে যিয়াদ (র) বলেন- "রমণীদের গাত্রাবরণের উপরও দৃষ্টিপাত করিও না। ইহাতে হৃদয়ে কামরিপু জাগিয়া উঠে।" স্ত্রীলোকদের পরিহিত বস্ত্র-দর্শন করা, তাহাদের সুগন্ধের ঘ্রাণ লওয়া এবং তাহাদের কণ্ঠস্বর শ্রবণ হইতে বিরত থাকা অবশ্য কর্তব্য। কামিনীদের নিকট সংবাদ পাঠানো, কোন সংবাদ তাহাদের নিকট হইতে শোনা, যে পথ দিয়া গমন করিলে রমণীদের দৃষ্টি তোমার উপর পতিত হয়, তুমি তাহাদিগকে দেখিতে না পাইলেও সেই পথ অবলম্বন করা তোমার উচিত নহে। কারণ, এইরূপ কার্যে মানব হৃদয়ে কামরিপু ও কুভাবের বীজ উপ্ত হয়। তদ্রূপ রমণীদের পক্ষেও পুরুষদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হারাম। কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে অকস্মাৎ তাহাদের উপর দৃষ্টি পড়িয়া গেলে ইহাতে কোন পাপ হইবে না বটে, কিন্তু এমন স্থলে দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করা অবৈধ। রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন-"তোমার পক্ষে প্রথম দৃষ্টি বৈধ, কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টি অবৈধ।" তিনি অন্যত্র বলেন-" কোন ব্যক্তি যদি কাহারও প্রতি প্রেমাসক্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজকে রক্ষা করত প্রেমাসক্তি লুক্কায়িত রাখে এবং সেই প্রেমানলে বিদগ্ধ অবস্থায় সে পরলোকগমন করে, তবে সেই ব্যক্তি শহীদের মর্তবা লাভ করিবে।" এস্থলে নিজকে রক্ষা করার অর্থ এই- প্রথম দৃষ্টি ত অকস্মাৎ অনিচ্ছাকৃতভাবে পড়িয়া গিয়াছিল, তৎপর চক্ষু সংযত রাখা, ইচ্ছা করিয়া দ্বিতীয়বার না দেখা, দর্শনের সুযোগ অন্বেষণ না করা, প্রেমাসক্তি হৃদয়ে গোপন রাখা এবং ইহার কোন নিদর্শনও প্রকাশ না করা।

রমণী সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ—নিমন্ত্রণ-আসর ও সভা-সমিতিতে পর্দা ব্যতীত নর-নারীর একত্রে উপবেশন এবং রমণী-প্রদর্শনীতে যেরূপ জঘন্য কুফল ফলিয়া থাকে, অন্য আর কিছুতেই তদ্রূপ ঘটে না। এইরূপ সভা ও সমাজে কেবল চাদর এবং চিত্তাকর্ষক অবগুণ্ঠন ও ঘোমটা দর্শনে কামভাব অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে; কেননা, ইহাতে পুরুষের হৃদয় ও চক্ষু অত্যধিক প্রলুব্ধ হইয়া থাকে। ইহার চেয়ে বরং সাজসজ্জা ব্যতীত সাধারণ বেশে অনাবৃত বদনে থাকাও ভাল। শুভ্র ও নানা বিচিত্র রঙ্গের চাদর পরিধান করিয়া চিত্তাকর্ষক অবগুণ্ঠনে বহির্গত হওয়া নারীদের পক্ষে অবৈধ। যে সকল নারী এইরূপ করে, তাহারা পাপী। যে পিতা, ভাই এবং স্বামী এইরূপ গর্হিত কার্যে স্ত্রীলোকদিগকে সম্মতি দেয়, তাহারাও এই পাপের অংশী হইবে। কোন পুরুষের পক্ষে কামভাবে স্ত্রীলোকের পরিহিত বস্ত্র পরিধান করা, ইহা হাতে লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করা বা গন্ধ লওয়া, হার বা অন্য কোন কোন প্রকার চিত্তাকর্ষক বস্তু রমণীদের নিকট প্রেরণ করা বা তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করা বা তাহাদের সহিত মিষ্টি বাক্যালাপ করা বৈধ নহে। তদ্রূপ স্ত্রীলোকদের পক্ষেও পরপুরুষদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা অবৈধ। কিন্তু নিতান্ত অপরিহার্য কারণবশত রমণীদের পক্ষে কর্কশ ভাষায় পরপুরুষদের সহিত কথা বলার বিধান আছে। এই সম্বন্ধে রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সহধর্মিনীদিগকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ـ

অর্থাৎ "যদি তোমরা পরহেযগারী কর তবে কথায় নম্রতা করিও না, তাহা হইলে যাহার অন্তরে রোগ আছে সে (তোমাদের প্রতি) লোভ করিবে এবং সোজা কথা বল।"

কোন স্ত্রীলোক পেয়ালার যে স্থানে মুখ দিয়া পানি পান করিয়াছে, ইচ্ছাপূর্বক সেই স্থানে মুখ দিয়া পানি পান করা এবং কোন নারী দন্তে কামড়াইয়া যে ফলের অংশবিশেষ কর্তন করত রাখিয়া দিয়াছে, ইহা আহার করা পুরুষের পক্ষে সঙ্গত নহে। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত আবূ আয়্যুব আন্‌সারী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর গৃহে অবস্থানকালে যে বর্তনে পানাহার করিতেন, যে বস্তু তিনি স্বীয় মুবারক অঙ্গুলী ও মুখে স্পর্শ করিতেন, পবিত্র জ্ঞানে সওয়াব লাভের আকাঙ্খায় হযরত আবূ আয়্যুব আন্‌সারী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর স্ত্রী ও সন্তানগণ সেই বর্তনের সেই সেই স্থানে স্পর্শ করিতেন। এই কার্যে যখন নিষ্কলুষ মনোভাব ও শ্রদ্ধার সংমিশ্রণ ঘটে, তখন উহাতে সওয়াব হয়। আনন্দানুভব ও কামভাব চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে পরস্ত্রীর উচ্ছিষ্ট পানাহার করিলে পাপ হইবে এবং পরকালে আযাব ভোগ করিতে হইবে। অতএব সর্বাধিক সতর্কতা অবলম্বনে পরস্ত্রীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত সকল বস্তু হইতে দূরে সরিয়া থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

প্রিয় পাঠক, সতর্ক হও, যে সকল দুশ্চরিত্র স্ত্রীলোক পর্দাবিহীনভাবে মানুষের সম্মুখে বিচরণ করে, তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার জন্য শয়তান মানব হৃদয়ে উত্তেজনা দিতে থাকে। তখন শয়তানের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করিয়া বলিবে- "আমি এই রমণীর প্রতি কেন চোখ তুলিয়া চাহিব? সে কুশ্রী হইলে আমার মন বিরক্ত হইবে, আবার পাপী ত হইবই। মন বিরক্ত হওয়ার কারণ এই যে, সেই রমণী সুন্দরী হইবে এই আশায়ই তো আমি তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিব। আর সে সুন্দরী হইলে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করা আমার পক্ষে হারাম। ইহাতে পাপ ত আছেই, তদুপরি বেদনাও হয়ত পাইব এবং কামনাও অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া দুর্দমনীয় লালসায় তাহার পশ্চাতে ধাবিত হইলে আমার ইহ-পরকাল সমূলে বিনষ্ট হইবে।"

একদা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পথে চলিবারকালে হঠাৎ এক সুন্দরী রমণীর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। তৎক্ষণাত তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করত স্ত্রী-সম্ভোগ করিলেন। তৎপর অনতিবিলম্বে স্নানান্তে গৃহের বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন- "যাহার সামনে পরপত্নী আসিয়া পড়ে এবং শয়তান তাহাকে যদি কামভাবে উত্তেজিত করে, তৎক্ষণাত গৃহে ফিরিয়া আসিয়া তাহার স্ত্রী-সম্ভোগ করা উচিত। তোমার নিজ স্ত্রীর নিকট যাহা আছে, পরস্ত্রীর নিকটও তাহাই আছে।"

তৃতীয় অধ্যায়

বাহুল্য কথন-লালসা বর্জনের উপায় ও রসনার আপদ

জিহবা আল্লাহ্‌র বিচিত্র সৃষ্টি-নৈপুণ্যের অন্যতম অদ্ভুত শিল্প। বাহ্যত ইহাকে শুধু একটি মাংসখণ্ড বলিয়া মনে হইলেও বাস্তবপক্ষে ইহার অবাধ প্রভাব নিখিল বিশ্বের উপর রহিয়াছে। ইহার শক্তি যে কেবল বর্তমানের উপরই চলে তাহা নহে, বরং যে সমুদয় বস্তু এখনও সৃষ্ট হয় নাই এবং যাহার অস্তিত্ব অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়াছে, এই সমস্তের উপরও ইহার শক্তি চলে। ইহা বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যতের বিষয়সমূহ সমভাবে অনায়াসে বর্ণনা করিতে পারে। রসনা বুদ্ধির প্রতিনিধিস্বরূপ। কারণ, বুদ্ধির সীমার বাহিরে কিছুই নাই এবং বুদ্ধিতে যাহা আসে, চিন্তায় ও কল্পনায় যাহা অংকিত হয়, রসনা তৎসমুদয়ই অবাধে বর্ণনা করিতে পারে। রসনা ব্যতীত অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের এইরূপ অপ্রতিহত শক্তি চলে না। দেখ, আকার ও রং ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে চোখের আধিপত্য নাই; শব্দ ব্যতীত অন্য কোন জিনিসের উপর কানের অধিকার নাই। শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা ইন্দ্রিয়াদির অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ, এক একটি নির্ধারিত বিষয় বা ক্ষেত্রের উপর ইহাদের এক একটি শক্তি সীমাবদ্ধ। সমস্ত দেহরাজ্যের উপর মনের যেরূপ অপ্রতিহত শক্তি চলে রসনারও সকল বিষয়ের উপর তদ্রূপ শক্তি রহিয়াছে। হৃদয়ের সাথে রসনাও সমান তালে কাজ করিয়া যাইতে পারে। মনে পূর্ব হইতে সংগৃহীত ছবি বা ভাব গ্রহণ করিয়া রসনা ভাষার সাহায্যে ইহা ব্যক্ত করে।

মনের উপর রসনার প্রভাব—একদিকে মন হইতে ছবি বা ভাব সংগ্রহ করিয়া রসনা যেরূপ ইহা ভাষায় বর্ণনা করে, অপরদিকে, মনও তদ্রূপ রসনার বর্ণনা হইতে ছবি বা ভাব গ্রহণ করিয়া নিজের মধ্যে অঙ্কন করিয়া লইতে পারে। এইজন্য রসনা যাহা প্রকাশ করে, ইহার প্রভাব হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া এক নূতন ভাবের সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ লক্ষ্য কর, রোদন বা বিলাপের সময় শোকগাথা রসনায় প্রকাশ করিতে থাকিলে একপ্রকার দীনভাব বা করুণারস মনকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। এইরূপ আবর্তনের দরুণ মানব-হৃদয়ে এক প্রকার তাপের সৃষ্টি হয়। এই হৃদয়োত্তাপ পরিশেষে মস্তকে যাইয়া আক্রমণ করিলে নয়নপথে অশ্রুবারি নির্গত হয়। তদ্রূপ মানুষ যখন আনন্দোদ্দীপক ও সুভাবের বাক্য বলে, তখন আনন্দে তাহার মন উদ্বেলিত হইতে থাকে এবং ইহার প্রভাবে তাহার হৃদয়ে প্রবৃত্তিসমূহ জাগিয়া উঠে। মোটকথা, মানুষ যেরূপ বাক্য বলে তাহার হৃদয়ে তদনুরূপ ভাবই জন্মিয়া থাকে। বক্তার কথা তাহার নিজ অন্তরে যেরূপ প্রভাব বিস্তার করে, শ্রোতার অন্তরেও তদ্রূপ প্রভাব বিস্তার করে।

এইজন্য অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ বা শ্রবণ করিলে অন্তর অন্ধকার হইয়া যায় এবং সত্য ও সাধু বাক্যে মন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে।

মিথ্যাবাদীদের অন্তর বিকৃত—মিথ্যা ও বক্র কথা বলিলে মানবমন অমসৃণ মুকুরের মত কর্কশ ও আঁকাবাঁকা হইয়া পড়ে। অমসৃণ মুকুরে যেমন কোন বস্তুর যথার্থ ছায়া প্রতিফলিত হয়না, কর্কশ ও টেরা হৃদয়ফলকেও তদ্রূপ কোন বস্তুর ছায়া যথার্থভাবে প্রতিবিম্বিত হয় না। অতিরঞ্জনকারী কবি ও মিথ্যাবাদীর অধিকাংশ স্বপ্নই অসত্য হইয়া থাকে। কারণ, মিথ্যাকথনের দরুণ তাহাদের হৃদয় অমসৃণ হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা সত্য কথা বলিতে অভ্যস্ত তাহাদের স্বপ্নও সত্য হইয়া থাকে।

মিথ্যাবাদী আল্লাহ্‌র যথার্থ দর্শনে বঞ্চিত—মিথ্যাবাদীর অন্তরে কোন পদার্থের ছায়া যথাযথভাবে প্রতিবিম্বিত না হওয়ার দরুন এখন যেমন সে সত্যস্বপ্ন দর্শন করে না, তদ্রূপ পরকালেও সে আল্লাহ্‌র যথার্থ দর্শন লাভ করিবে না; সে সব ফাঁপা ও শূন্য দেখিবে। আল্লাহ্‌র দর্শন সর্বাধিক মাধুর্যপূর্ণ; কিন্তু মিথ্যাবাদী এই পরম সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিত থাকিবে। সে যে আল্লাহ্‌র যথার্থ দর্শনলাভে বঞ্চিত থাকিবে তাহাই নহে, বরং অমসৃণ মুকুরে যেমন পরম সুন্দর মুখমণ্ডলও কুশ্রী ও ভীষণ দেখায় মিথ্যাবাদীর হৃদয়ে পরলোকের বিষয়াদিও তদ্রূপ দেখাইবে এবং ইহাতে তাহার দুঃখ ও যাতনার সীমা থাকিবে না। মোটকথা, হৃদয়ের মসৃণতা ও বন্ধুরতা রসনা নিঃসৃত বাক্যের উপর নির্ভরশীল; অর্থাৎ সত্য বলিলে হৃদয় মসৃণ হয়, আর মিথ্যা বলিলে অমসৃণ হয়। এইজন্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "অন্তর ঠিক না হওয়া পর্যন্ত ঈমান ঠিক হয় না এবং রসনা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত ঈমান ঠিক হয় না।"

মোটকথা, জিহবার অনিষ্টকারিতা ও আপদ হইতে অব্যাহতি লাভ করা একটি অতীব জরুরী ধর্ম কর্তব্য। অতএব, এই অধ্যায়ে প্রথমত নীরবতার ফযীলত বর্ণিত হইবে; তৎপর রসনাপ্রসূত অনিষ্ট ও আপদসমূহ ক্রমশ বর্ণিত হইবে, যথা ঃ- বহুকথন, নিরর্থক বাক্য ব্যয়, ঝগড়া, বাদানুবাদ, অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ, গালাগালি ও তিরস্কার করা, ধিক্কার ও অভিশাপ দেওয়া, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা, মিথ্যা বলা, পরনিন্দা ও চোগলখোরী করা, দ্বিমুখী হওয়া, অতিরিক্ত প্রশংসা করা ইত্যাদি। সঙ্গে-সঙ্গে ইহাদের অনিষ্টকারিতা হইতে পরিত্রাণের উপায়ও প্রদর্শন করা হইবে।

নীরবতার উপকারিতা—রসনা হইতে বহু আপদ জন্মে। উহা হইতে নিস্তার লাভ করা বড় দুষ্কর; আর নীরবতা অবলম্বনই নিস্তার লাভের উৎকৃষ্ট উপায়। অতএব, নিতান্ত আবশ্যক না হইলে কথা বলা উচিত নহে। বুযুর্গগণ বলিয়াছেন- "যাহার আহার, নিদ্রা ও বাক্য অত্যাবশ্যক অভাব মোচনের জন্যই হইয়া থাকে, তিনি আব্‌দাল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।"

আল্লাহ্ বলেন ঃ

لَا خَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ -

অর্থাৎ "সাধারণ লোকের অধিকাংশ গুপ্ত পরামর্শে মঙ্গল নাই। হাঁ, তবে যে ব্যক্তি এরূপ যে দান অথবা কোন সৎকার্য বা লোকের মধ্যে পরস্পর সন্ধি করিয়া দিবার উৎসাহ প্রদান করে (ইহাতে মঙ্গল আছে)।"

রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ مَنْ صَمَتَ نَجٰى অর্থাৎ "যে ব্যক্তি মৌন রহিয়াছে, সে মুক্তি পাইয়াছে।" তিনি অন্যত্র বলেন- "উদর, কামেন্দ্রিয় ও রসনার ক্ষতি হইতে আল্লাহ্ যাহাকে বাঁচাইয়াছেন, সে সকল আপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছে।"

হযরত মা'আয রাযিয়াল্লাহু আনহু একদা রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন- "কোন কাজ উত্তম?" তিনি স্বীয় পবিত্র রসনা মুখ হইতে বাহির করত অঙ্গুলী দ্বারা চাপিয়া ধরিলেন; অর্থাৎ ইঙ্গিতে ইহাই বলিলেন যে, মৌন থাকাই উত্তম কার্য। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন- "আমি একদা হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দেখিতে পাইলাম, তিনি হাত দ্বারা স্বীয় রসনা টানিতেছেন এবং রগড়াইতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- 'হে আল্লাহর রাসূলের প্রতিনিধি, আপনি কি করিতেছেন?' তিনি বলিলেন- 'এই ক্ষীণ বস্তুটি (আমার উপর) অনেক কাজ চাপাইয়া দিয়াছে।"

রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "রসনাই মানুষের অধিকাংশ পাপের উৎস।" একদা তিনি লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন- 'সহজতম ইবাদত তোমাদিগকে শিক্ষা দিতেছি, ইহা নীরব রসনা ও সৎস্বভাব।" তিনি অন্যত্র বলেন- "যাহারা আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান আনিয়াছে, তাহাদিগকে বলিয়া দাও তাহারা যেন ভাল কথা ব্যতীত আর কিছুই না বলে, অথবা নীরব থাকে।" লোকে হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামকে জিজ্ঞাসা করিল- "আমাদিগকে এমন কিছুর সন্ধান প্রদান করুন যদ্দ্বারা আমরা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতে পারিব।" তিনি বলিলেন- "কখনও কথা বলিও না।" তাহারা বলিল- "ইহা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়।" তিনি বলিলেন- "তাহা হইলে ভাল কথা ব্যতীত আর কিছুই বলিও না।" রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "কোন মুসলমানকে গম্ভীর ও নীরব দেখিতে পাইলে তাহার সংসর্গ কর; এইরূপ ব্যক্তি অন্তদৃষ্টি ও জ্ঞানহীন হইতে পারে না।" হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম বলেন- "ইবাদতের দশটি অংশ; নীরবতার মধ্যে উহার নয়টি এবং অবশিষ্ট একটি লোকসংসর্গ পরিত্যাগ করত নির্জনবাসে রহিয়াছে।" রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "যে ব্যক্তি অতিরিক্ত কথা বলে তাহার কথায় অধিক অপরাধ ও ভুল হয়, সে বড় পাপী; দোযখের অগ্নিই তাহার জন্য প্রকৃষ্ট স্থান।"

এই কারণেই হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্হু মুখে পাথর দিয়া থাকিতেন যেন কথা বলিতে না পারেন। হযরত ইব্‌নে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন- "কারাবদ্ধ থাকিবার নিমিত্ত রসনার ন্যায় এমন উপযুক্ত পদার্থ আর কিছুই নাই।"

হযরত ইউনুস ইব্নে ওবায়দ (র) বলেন- "আমি যাহাদিগকে নীরবে থাকিতে দেখিয়াছি, দেখিলাম তাহাদের সকল কর্মেই সুফল ফলিয়া থাকে।" একদা হযরত আমীর মুআবিয়ার সম্মুখে বহুলোক বাক্যালাপ করিতেছিল; কেবল হযরত আহ্নাফ (রা) নীরবে বসিয়াছিলেন। হযরত আমীর মুআবিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- "তুমি কিছু বলিতেছ না কেন?" তিনি বলিলেন- "অসত্য কথা বলিতে আল্লাহ্কে ভয় করি, আর সত্য বলিতে তোমাদিগকে ভয় করিয়া থাকি।" হযরত রাবী ইব্নে খাসিম (র) বিশ বৎসর পর্যন্ত পার্থিব কোন বাক্য উচ্চারণ করেন নাই। প্রত্যুষে জাগ্রত হইয়াই তিনি কাগজ ও কলম দোয়াত নিকটে রাখিতেন এবং প্রয়োজনীয় কথা লিখিয়া দিতেন। রজনীতে আবার নিজের নিকট হইতে ঐ সকল বাক্যের হিসাব গ্রহণ করিতেন।

রসনা হইতে বহু বিপদ উৎপন্ন হয়। রসনা হইতে অহরহ নিরর্থক কথাই বহির্গত হয়। বলা খুব সহজ; কিন্তু কোন্ কথা ভাল, আর কোন্টি মন্দ, ইহা বুঝা বড় দুষ্কর। এইজন্যই মৌনব্রত অবলম্বনে এত ফযীলত রহিয়াছে। নির্বাক থাকিলে ভাল-মন্দ নির্ধারণ সমস্যা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, মানসিক শান্তি অটুট থাকে এবং আল্লাহ্র স্মরণ ও ধ্যানের অধিক সময় ও সুযোগ মিলে।

কথার শ্রেণী বিভাগ—লোকে যে সকল কথা বলে উহাকে চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

প্রথম শ্রেণী—যে কথায় কেবল ক্ষতিই ক্ষতি।

দ্বিতীয় শ্রেণী—যে কথায় উপকার ও অপরকার মিশ্রিত রহিয়াছে।

তৃতীয় শ্রেণী—যে কথায় উপকার ও অপকার কিছুই নাই; ইহাই নিরর্থক কথা। তবে ইহার অপকারিতা এতটুকু যে, সেই কথা বলিতে যে সময় লাগে ইহা বৃথা অপব্যয় হইয়া থাকে।

চতুর্থ শ্রেণী—যে কথায় কেবল উপকারই উপকার এবং যাহাতে অপকারের লেশমাত্রও নাই।

এই চারি শ্রেণীর কথার মধ্যে প্রথম তিন শ্রেণীর কথা বলিবার অনুপযুক্ত; উহা সযত্নে পরিহার করিতে হইবে। একমাত্র শেষোক্ত চতুর্থ শ্রেণীর কথা সম্বন্ধেই আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِلاَّ مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ ـ الاية ـ

আর রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামও এই সম্বন্ধেই বলিয়াছেন- "যে ব্যক্তি মৌন রহিয়াছে সে মুক্তি পাইয়াছে।"

রসনার বিপদসমূহ সম্বন্ধে সম্যকরূপে অবগত না হইলে উল্লিখিত বর্ণনার গূঢ়তত্ত্ব উপলব্ধি করা যাইবে না। এইজন্যই ইন্শাআল্লাহ্ একে একে এই আপদসমূহ বিস্তারিতভাবে আমরা বর্ণনা করিয়া দিতেছি।

রসনার আপদ

প্রথম আপদ—নিরর্থক অপ্রয়োজনীয় বাক্য। যে বাক্য বলার কোন আবশ্যকতা নাই, যাহা না বলিলে ইহকাল ও পরকালের কোন অনিষ্ট হয় না, এইরূপ কথা বলিলে মুসলমানী সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়। এইজন্য রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন-"যাহাতে মানুষের (ইহকাল ও পরকালে) কোন লাভ নাই তাহা পরিহার করাই তাহার ইসলামের সৌন্দর্য।" এই বেহুদা অনাবশ্যক কথা কাহাকে বলে ইহাও উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে। ধরিয়া লও, অনেক লোকের মধ্যে উপবেশন করিয়া তুমি তোমার দেশ-ভ্রমণের কাহিনী বর্ণনা করিতেছ, বিদেশ পর্যটনে যে সকল পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল ও বাগানাদি তুমি দর্শন করিয়াছ, উহার ঘটনা শুনাইতেছ, বিদেশ ভ্রমণকালে তোমার কি কি অবস্থা ঘটিয়াছে উহা বলিতেছ। এই সমুদয় বিষয় যাহা দর্শন, শ্রবণ ও ভোগ করিয়াছ যথাযথ বর্ণনা করিতেছ এবং উহার কোন বিষয় হ্রাস-বৃদ্ধি করিতেছ না। এতদ্সত্ত্বেও এই সকল ঘটনা বর্ণনা করা নিরর্থক ও অপ্রয়োজনীয়; কেননা তুমি উহা বর্ণনা না করিলে কিছুই ক্ষতি হইবে না।

মনে কর, তোমার সহিত কাহারও সাক্ষাত ঘটিল এবং নিরর্থক তুমি তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলে। এইরূপ প্রশ্নোত্তরে তোমার বা উত্তরদাতার কোনই লাভ বা ক্ষতি নাই। তাহা হইলেই এইরূপ প্রশ্ন অপ্রয়োজনীয়। আবার এমন প্রশ্নও হইয়া থাকে যাহাতে উত্তরদাতার অনিষ্ট হয়। যেমন মনে কর, তুমি এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলে- " আজ তুমি রোযা রাখিয়াছ কি?" সে যদি ঠিক বলে- "হাঁ, আমি রোযা রাখিয়াছি," তবে ইবাদত প্রকাশ করা হয়। আবার রোযা অস্বীকার করিলেও মিথ্যা বলার অপরাধে অপরাধী হইতে হয়। সুতরাং অনুধাবন কর, একটা অশোভন প্রশ্ন করিয়া তাহাকে কিরূপ উভয় সঙ্কটে নিপতিত করিলে। তদ্রূপ যদি কাহাকেও জিজ্ঞাসা কর- "তুমি কোথা হইতে আসিলে? তুমি কি কর? তুমি পূর্বে কি করিতেছিলে?" ব্যক্তিগত কারণে এই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান অসঙ্গত ও অসুবিধাজনক ভাবিয়া জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি হয়ত মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। অপরদিকে, মিথ্যা অবশ্য বর্জনীয় এবং একটি মহাপাপ। যে উক্তিতে কোন লাভ-লোকসান, উপকার-অপকার এবং মিথ্যার লেশমাত্রও নাই ইহাকেই নিরর্থক কথা বলে।

বর্ণিত আছে, মহাত্মা লুকমান হাকীম পূর্ণ এক বৎসরকাল যাবত হযরত দাউদ আলায়হিস সালামের নিকট গমনাগমন করিতেছিলেন। তিনি যখনই গমন করিতেন তখনই হযরত বর্ম নির্মাণে লিপ্ত থাকিতেন। কিন্তু তিনি কি কাজে লিপ্ত ছিলেন, ইহা লুকমান হাকীম বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই, জানিবার ইচ্ছা থাকিলেও কোনদিন জিজ্ঞাসা করেন নাই। পরিশেষে, হযরত দাউদ আলায়হিস সালাম কাজটি সমাপ্ত করত এতদিনে প্রস্তুত বর্মটি পরিধানপূর্বক বলিলেন– "যুদ্ধের জন্য ইহা উৎকৃষ্ট পোশাক।" লুকমান হাকীম তখন বুঝিলেন যে, ইহা বর্ম এবং বলিলেন– "নীরবতা আশ্চর্য কৌশল, কিন্তু ইহার প্রতি কাহারও আসক্তি নাই।"

অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসাকারীর ত্রিবিধ উদ্দেশ্য থাকিতে পারে; যথা ঃ (১) মানুষের অবস্থা জ্ঞাত হওয়া, (২) জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপের সুযোগ লাভ করা, অথবা (৩) জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারা তাহার প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করা। অনাবশ্যক কথনের অভিলাষ পরিহারের দুই প্রকার উপায় আছে; যথা ঃ জ্ঞানমূলক উপায় ও অনুষ্ঠানমূলক উপায়।

জ্ঞানমূলক উপায়—হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া লইবে যে মৃত্যু সম্মুখে অতি সন্নিকটে রহিয়াছে, কখন জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হইবে নিশ্চয়তা নাই। জীবনের যে সময়টুকু বাকী আছে ইহা বৃথাকাজে অপব্যয় না করিয়া একমাত্র আল্লাহ্‌র যিকিরে অতিবাহিত করিতে হইবে। ইহাই পরকালের সম্পদ। কাজেই এই সম্পদ যত অধিক সম্ভব সংগ্রহ করিয়া লওয়া উচিত আর বৃথা কথনে সময় অপচয় করিলে স্বীয় ক্ষতিই সাধন করা হয়।

অনুষ্ঠানমূলক উপায়—এমন ব্যবস্থা করা যাহাতে অনাবশ্যক কথনের সুযোগ-সুবিধা বিদূরিত হয়। নির্জনে অবস্থান করিলে বা মুখে প্রস্তরখন্ড রাখিলে কথা বলার সুযোগ পাওয়া যায় না।

হাদীস শরীফে আসিয়াছে, ওহুদের যুদ্ধে এক যুবক শহীদ হইলেন। দেখা গেল, তাঁহার উদরে প্রস্তরখন্ড বাঁধা রহিয়াছে। ক্ষুধার যন্ত্রণায় তিনি উদরে পাথর বাঁধিয়া জিহাদে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহার জননী পুত্রের মুখমন্ডল হইতে ধুলিবালি অপসারণ করিতে করিতে বলিলেন ঃ هَنِيًّا لَّكَ الْجَنَّةُ অর্থাৎ " হে বৎস, তোমার জন্য বেহেশ্‌ত মোবারক হউক।" ইহা শুনিয়া রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন– "কিরূপে তুমি অবগত হইলে (যে, সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে)? হয়ত সে এমন দ্রব্যে কৃপণতা করিয়াছে যাহা তাহার পক্ষে একেবারে নিষ্প্রয়োজনীয় বা এমন বিষয়ে কথা বলিয়াছে যাহাতে তাহার আবশ্যকতা ছিল না।" এই হাদীসের তাৎপর্য এই, পরকালে শহীদের নিকট হইতেও নিরর্থক কথার হিসাব গ্রহণ করা হইবে এবং এমন ব্যক্তির বদনই প্রসন্ন যাহার কোন যাতনা নাই ও হিসাব প্রদান করিতে হইবে না।

একদা রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন– "এক বেহেশ্‌তী ব্যক্তি এখন দরজা দিয়া আসিতেছে।" এমন সময় হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু তথায় আগমন করিলেন। সাহাবাগণ তাঁহার আমল অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন– "আপনার আমল (ক্রিয়াকলাপ) কি?" তিনি বলিলেন– "আমার আমল ত অতি সামান্য। কিন্তু যে-দ্রব্যে আমার আবশ্যকতা নাই ইহার নিকটেও আমি গমন করি না এবং অপরের অমঙ্গল কামনা করি না।" তোমার বক্তব্য যদি একটি বাক্যে প্রকাশ করিতে পার, অথচ তোমার কথা দীর্ঘ করত দুইটি বাক্যে প্রকাশ কর, তবে দ্বিতীয় বাক্যটি অনাবশ্যক কথার মধ্যে পরিগণিত হইবে এবং পরকালে ইহা তোমার বিপদের কারণ হইবে।

একজন সাহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন– "কেহ আমাকে কোন প্রশ্ন করিলে, ইহার উত্তর প্রদান আমার নিকট পিপাসার্তের পক্ষে ঠান্ডা পানি অপেক্ষা অধিক প্রিয় হইলেও অনাবশ্যক কথনের আশংকায় আমি উত্তর প্রদানে নিরস্ত থাকি।" হযরত মুরতারাফ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) বলেন– "সর্বস্থানে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ অপেক্ষা তাঁহার গৌরব ও মাহাত্ম্য তোমাদের অন্তরে অধিক হওয়া আবশ্যক। যেমন, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদির প্রতি বিরক্ত হইয়া আল্লাহ্‌র নাম লইয়া ইহাদিগকে অভিশাপ দেওয়া উচিত নহে।" রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি বাহুল্য কথা হইতে বিরত রহিয়াছে এবং অতিরিক্ত ধন বিতরণ করিয়া দিয়াছে, অর্থাৎ থলিয়ার মুখের বন্ধন খুলিয়া স্বীয় মুখে বন্ধন লাগাইতে পারিয়াছে, সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান।" তিনি অন্যত্র বলেন– "বাচালতা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বস্তু মানবের আর কিছুই নাই।"

সতর্ক হও। কারণ, মানুষ যাহা কিছু বলে তৎসমুদয়ই তাহার আমলনামায় লিখিত হয়। এই সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ অর্থাৎ "মানুষের সহিত আল্লাহ্ কর্তৃক নিযুক্ত চৌকিদার ফেরেশ্‌তাগণ সর্বদা প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন; মানুষের মুখ হইতে যে কোন বাক্যই নির্গত হউক না কেন, তৎক্ষণাত তাঁহারা ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন।"

দ্বিতীয় আপদ—বিদআত[১] ও পাপকার্যের বর্ণনা করা। বিদআত বিষয় লইয়া নিরর্থক বাক্যালাপ, বাক্-বিতন্ডা ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া এবং পাপানুষ্ঠানের গল্প করা নিতান্ত অনুচিত ও ক্ষতিকর। পাপানুষ্ঠানের গল্প এই মনে কর, একের সহিত অপরের ঝগড়া হইল; একজন অপরজনকে গালি বা কষ্ট দিল; কেহ-বা মদ্যপান, নৃত্যগীতাদির আসর জমাইল; আর তুমি এই সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলে বা কুৎসিত কোন বিষয় রসিকতার সহিত ব্যক্ত করিয়া মানুষকে হাসাইলে। তদুপরি, বিদআতের আলোচনায় এবং পাপানুষ্ঠানের বর্ণনাতেও রসনার উল্লিখিত প্রথম প্রকার আপদ রহিয়াছে। অর্থাৎ ইহাতে অনাবশ্যক কথায় মূল্যবান সময় অপচয় এবং বক্তার ইসলামী গাম্ভীর্য ও মর্যাদা নষ্ট হয়। রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, এমন লোক আছে, যে অসতর্কভাবে এইরূপ কথা বলিয়া ফেলে যাহার গূঢ়তত্ত্ব সে উপলব্ধি করে না, অথচ ইহা তাহাকে দোযখের কূপ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। আবার এমন লোকও আছে, যে অসতর্কভাবে এইরূপ কথা বলিয়া ফেলে যাহা তাহাকে বেহেশত পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়।

তৃতীয় আপদ—অন্যের কথার প্রতিবাদ করা ও বাদানুবাদে লিপ্ত হওয়া। কোন কোন মানুষের স্বভাব এই যে, অপরের কথা শুনিলেই সে বাদ-প্রতিবাদে ইহা অগ্রাহ্য করে এবং বলে– 'ইহা এমন নয় তেমন; ঐ উক্তির অর্থ সেইরূপ নহে, এইরূপ। তুমি

১. শরীয়তে অনুমোদিত নহে এইরূপ নতুন নতুন চালচলন ও আচরণকে ধর্ম-বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলে উহাকে বিদ্‌আত বলে। –অনুবাদক।

নির্বোধ, মুর্খ ও মিথ্যাবাদী; আমি বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও সত্যবাদী।" এইরূপ বাদানুবাদে দুই প্রকার অনিষ্ঠকর প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে; যথা ঃ- (১) অহঙ্কার ও (২) হিংস্রতা।

রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- 'যে ব্যক্তি কথোপকথনের সময় বাদানুবাদ ও ঝগড়া হইতে বিরত থাকে এবং অসত্য কথা বলে না, তাহার জন্য বেহেশ্‌তে একটি গৃহ প্রস্তুত হয়। আর যে ব্যক্তি সাবধানতা অবলম্বনপূর্বক সত্য কথাও বলে না, তাহার জন্য বেহেশ্‌তের উচ্চ স্থানে একটি গৃহ নির্মিত হয়।" শেষোক্ত ব্যক্তির সওয়াব এত অধিক হওয়ার কারণ এই, অপরের অযৌক্তিক ও অসত্য বাক্য সহ্য করা নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার। রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অন্যত্র বলেন- "স্বীয় মত সত্য হইলেও তর্কস্থলে যে ব্যক্তি বাদানুবাদে নিরস্ত থাকে না, তাহার ঈমান পূর্ণতা লাভ করে নাই।"

পার্থিব বিষয়াদিতে বাদানুবাদ—ধর্মমত লইয়াই যে কেবল বাদানুবাদ হয়, তাহা নহে, বরং পার্থিব দৈনন্দিন ছোটখাট বিষয়াদি লইয়াও বাদানুবাদ হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ মনে কর, কেহ একটি ডালিম দেখিয়া বলিল- "ইহা মিষ্টি; আর তুমি বলিলে- না, ইহা টক।" অথবা কেহ বলিল- "অমুক স্থান এখান হইতে এক ক্রোশ দূরে; আর তুমি বলিলে- "না, ইহা কিছুতেই হইতে পারে না।" এই প্রকার বাদানুবাদ নিতান্ত অন্যায়। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "কাহারও সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ হইলে দুই রাকাআত নামায ইহার প্রায়শ্চিত্ত।" কেহ কিছু বলিলে ইহার ভুল-ত্রুটি বাহির করিয়া সমালোচনা করা অবৈধ এবং ইহাও উল্লিখিত বাদ-প্রতিবাদের অন্তর্ভুক্ত। এইরূপ করিলে লোকের মনে অযথা কষ্ট দেওয়া হয় এবং কোন মুসলমানকে অকারণে কষ্ট দেওয়া সঙ্গত নহে। অপরপক্ষে, ঐরূপ বাক্যসমূহের ভুল-ত্রুটি প্রকাশ করিয়া সংশোধন করাও অবশ্য কর্তব্য নহে। বরং ঐ সকল স্থানে নীরব থাকাই ঈমানের নিদর্শন।

ধর্ম বিষয়ে বাদানুবাদ—ধর্ম-বিষয় অবলম্বনে বাদানুবাদকে 'জিদাল' বলে। ইহাও দূষণীয়। কিন্তু সত্য বিষয় বুঝাইয়া দিলে যদি প্রতীয়মান হয় যে, অপরপক্ষ মানিয়া লইবে, তবে নির্জনে বলাতে কোন দোষ নেই; নচেৎ নীরব থাকাই উত্তম। রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "ধর্ম-বিষয় লইয়া কোন জাতির মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ প্রবল না হইয়া উঠা পর্যন্ত সেই জাতি পথভ্রষ্ট হয় না।" লুকমান হাকীম স্বীয় পুত্রকে উপদেশ প্রদানকালে বলিলেন- " হে বৎস, ধর্ম-বিষয় লইয়া আলিমগণের সহিত ঝগড়া করিও না। অন্যথা তাঁহারা তোমাকে শত্রু বলিয়া গণ্য করিবেন।"

অযৌক্তিক ও অসত্য কথার প্রতিবাদ না করিয়া নিস্তব্ধ থাকা বড় সহিষ্ণুতার প্রমাণ। ইহাতে জিহাদে বিধর্মীগণের অন্যায় আক্রমণ সহ্য করার সওয়াবের ন্যায় সওয়াব পাওয়া যায়। হযরত দাউদ তা'য়ী (র) লোকসংসর্গ ত্যাগ করত নির্জন বাস অবলম্বন করিলে হযরত ইমাম আবূ হানীফা রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা

করিলেন- "তুমি বাহিরে আস না কেন?" তিনি বলিলেন- "আত্ম-দমন করত ধর্মবিষয়ে বাদানুবাদ হইতে নিজকে বিরত রাখিতেছি।" হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র) বলিলেন- "ধর্ম-বিষয়ে বাদ-প্রতিবাদের সভায় গমন কর ও শ্রবণ কর; কিন্তু কিছু না বলিয়া চুপ থাক।" তিনি বলিলেন- "হাঁ, আমি ইহাই করিয়া আসিতেছি; কিন্তু উহা অপেক্ষা কঠিন অধ্যবসায়ের কার্য আর কিছুই নাই।"

কোন স্থানের লোক ধর্ম বিষয়ক কুসংস্কারে লিপ্ত হইলে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ বাদ-প্রতিবাদ দ্বারা মান-মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যে যদি বলে, ধর্ম-মত লইয়া তর্ক-বিতর্ক করা ধর্মের অন্তর্ভুক্ত একটি ভাল কাজ, তবে মনে করিবে যে, সেই স্থানে কঠিনতম বিপদ নামিয়া আসিয়াছে। তাহাদের হিংস্রতা ও অহমিকা তাহাদিগকে ঐরূপ বাদ-প্রতিবাদে প্রবৃত্ত করে। কিন্তু সাধারণ লোক বুঝিতে না পারিয়া মনে করে, ধর্ম-বিষয় লইয়া বাদ-প্রতিবাদ করা একটি সওয়াবের কাজ এবং ক্রমে-ক্রমে বাদ-প্রতিবাদ করিবার অভিলাষ তাহাদের মনে এত প্রবল হইয়া উঠে যে, পরে কিছুতেই তাহারা উহা হইতে বিরত থাকিতে পারে না। কারণ, তাহাদের প্রবৃত্তি তখন এইরূপ বাদ-প্রতিবাদে পরম আনন্দ উপভোগ করিতে থাকে।

হযরত মালিক ইব্‌ন আনাস্ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন- "ধর্মমত লইয়া বাদ-প্রতিবাদ করা ধর্মের অন্তর্ভুক্ত নহে।" পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ ধর্মমত লইয়া বাদানুবাদ করিতে মানা করিয়াছেন। কেহ কোন বিদ্‌আত কার্য প্রচলন করিলে বা কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের আদেশ-নিষেধ অমান্য করিলে তাহার বাদানুবাদ না করিয়া সেই ব্যক্তিকে সত্য কথা বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেন; ইহাতে ফল না দর্শিলে এরূপ লোকের পশ্চাতে না লাগিয়া বরং তাঁহারা ফিরিয়া আসিতেন।

চতুর্থ আপদ—ধন-সম্পদ লইয়া ঝগড়া-বিবাদ করা। ধন-সম্পদ লইয়া ঝগড়া-বিবাদ করা এবং ইহার জন্য বিচারক বা কোন সালিসের আশ্রয় গ্রহণ অত্যন্ত অনিষ্টকর। রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "কোন অজ্ঞ ব্যক্তি অপরের সহিত ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত থাকা পর্যন্ত সে আল্লাহ্‌র ক্রোধ ও অসন্তোষের মধ্যে থাকে।" বুযুর্গগণ বলিয়াছেন- "ধন-সম্পদের বিবাদ মন অপবিত্র করে, জীবন বিস্বাদ করিয়া তোলে এবং ধর্মভাব হ্রাস করে; অন্য কোন বিষয়ে এইরূপ হয় না।" তাহারা আরও বলেন- "কোন পরহেযগার ব্যক্তি ধন-সম্পদ লইয়া ঝগড়া-বিবাদ করেন নাই; কারণ, অতিরিক্ত কথা বলিলে ঝগড়া-বিবাদ শেষ হয় না এবং পরহেযগারগণ অতিরিক্ত কথা বলেন না।" ঝগড়া-বিবাদে অন্য কোন অনিষ্টি পরিলক্ষিত না হইলেও ইহা ত স্পষ্ট যে, বিবাদকালে কেহই বিপক্ষের সহিত মিষ্ট ও প্রিয় কথা বলিতে পারে না। অথচ মিষ্ট কথায় অশেষ ফযীলত রহিয়াছে। সুতরাং বিবাদকারী এই ফযীলত হইতে বঞ্চিত হয়। অতএব কাহারও সহিত যাহাতে ঝগড়া-বিবাদ না বাধে, তৎপ্রতি বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্তব্য। ইহা সত্ত্বেও ঝগড়া বাধিয়া গেলে, ঝগড়াকালে সত্য ব্যতীত অসত্য বলিবে না, কাহারও মনে কষ্ট

দেওয়ার অভিলাষ করিবে না এবং কটুবাক্য ও অতিরিক্ত কথা হইতে বিরত থাকিবে, অন্যথা তোমার ধর্মকর্ম বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

পঞ্চম আপদ—অশ্লীল কথা বলা। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– " যে ব্যক্তি অশ্লীল কথা বলে তাহার জন্য বেহেশ্‌ত হারাম।" তিনি অন্যত্র বলেন– "দোষখবাসী কতিপয় লোকের মুখ দিয়া পুতিগন্ধময় অপবিত্র দ্রব্যাদি নির্গত হইবে এবং উহার দুর্গন্ধে দোযখবাসীগণ অভিযোগ করিতে থাকিবে ও জিজ্ঞাসা করিবে– "ইহারা কে?" তখন বলা হইবে– "ইহারা দুনিয়াতে কুৎসিত ও অশ্লীল কথা পছন্দ করিত এবং গালি-গালাজ করিত।" হযরত ইবরাহীম ইব্‌ন মাইসারা (র) বলেন– "যে ব্যক্তি অশ্লীল বাক্য বলে তাহার আকার কিয়ামতের দিন কুকুরের ন্যায় হইবে।"

অধিকাংশ অশ্লীল কথা স্ত্রীসহবাসের কুৎসিত ব্যাখ্যা হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। কাহাকেও এইরূপ অশ্লীল কথার সহিত বিজড়িত করিলেই তাহাকে গালি দেওয়া হইল। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "যে ব্যক্তি স্বীয় মাতাপিতাকে গালি দেয় তাহার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত।" সাহাবাগণ (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন– "ইয়া রাসূলুল্লাহ্, কোন ব্যক্তি এইরূপ করিবে?" তিনি বলিলেন– "অপরের মাতাপিতাকে গালি দিলে সেই ব্যক্তি আবার তাহার মাতাপিতাকে গালি দেয়; এইরূপ স্থলে সে-ই যেন স্বীয় মাতাপিতাকে গালি দিল।"

অনিবার্য অশ্লীল বাক্য প্রকাশের ধারা—সঙ্গম সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে হইলে ইঙ্গিতে বলা আবশ্যক, স্পষ্টভাবে বলিলেই অশ্লীল বাক্য হইয়া পড়ে। অন্যান্য মন্দ কথাও পরিষ্কারভাবে না বলিয়া ইঙ্গিতে বলিবে। নারীদের নাম স্পষ্টভাবে উচ্চস্বরে লওয়া উচিত নহে; বরং তাহাদিগকে মাস্তুরাত বা পর্দানশীল বলিবে। তাহাদিগকে নাম ধরিয়া ডাকিতে হইলে অনুচ্ছস্বরে ডাকিবে। কাহারও কোন কুৎসিত রোগ যেমন অর্শ, কুষ্ঠ ইত্যাদি হইলে রোগের নাম পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ না করিয়া বরং সাধারণভাবে 'পীড়া' বলা আবশ্যক। স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিলে উহাও অশ্লীল বাক্য হইয়া পড়ে।

ষষ্ঠ আপদ—লা'নত করা বা অভিশাপ দেওয়া। জীবজন্তু, কাপড়-চোপড়, লোকজন অথবা অন্য কোন পদার্থের প্রতিও লা'নত করা অন্যায়। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "মুসলমান লা'নত করে না।" একদা তিনি কতিপয় সাহাবীসহ (রা) প্রবাসে ছিলেন। এমন সময় দলের জনৈকা রমণী একটি উটকে অভিসম্পাত করিল। হযরত সেই অভিশপ্ত উটটিকে দল হইতে বাহির করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে ইহা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। উটটি স্বেচ্ছায় বহুদিন এদিক সেদিক ঘুরিয়া বেড়াইল, কিন্তু অভিশপ্ত বলিয়া কেহই ইহার নিকটবর্তী হইল না।

হযরত আবূ দারদা রাযিয়াল্লাহ্ আন্‌হু বলেন– "ভূমি বা কোন পদার্থকে লা'নত করিলে ইহা আল্লাহ্‌র নিকট বলিতে থাকে– 'আমাদের উভয়ের মধ্যে যে অধিক পাপী, তাহার উপর লা'নত হউক।" হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু একদা কোন

পদার্থকে লা'নত করিলেন। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইহা শুনিয়া বলিলেন– "হে আবূ বকর, সিদ্দীক হইয়াও তুমি লা'নত করিলে! ইহা তোমার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই; কা'বা শরীফের প্রভুর কসম, তুমি সিদ্দীক; লা'নত করা তোমার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই; কা'বা শরীফের প্রভুর কসম, তুমি সিদ্দীক; লা'নত করা তোমার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই।" হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তৎক্ষণাত তওবা করিলেন এবং ইহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ একটি ক্রীতদাসকে আযাদ করিলেন।

মানুষের প্রতি অভিশাপ—লোকজনের প্রতি লা'নত করা উচিত নহে। তবে সাধারণভাবে পাপীদের প্রতি লা'নত করা যাইতে পারে; যথা ঃ যালিম, কাফির, ফাসিক ও বিদআতীদের প্রতি লা'নত। কিন্তু মু'তাযিলা ও কিরামী সম্প্রদায়ের উপর লা'নত করা উচিত নহে; কেননা ইহাতে বিপদের আশঙ্কা আছে এবং সাম্প্রদায়িক হিংসা-বিদ্বেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ঝগড়া-বিবাদে অশান্তি ঘটিতে পারে। অতএব এই সকল সম্প্রদায়ের উপর লা'নত করা হইতে বিরত থাকা উচিত। তবে যে সকল সম্প্রদায় শরীয়তে অভিশপ্ত, উহাদিগকে অভিশাপ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু শরীয়তে অভিশপ্ত কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া বা কাহারও নাম লইয়া লা'নত করা যাইতে পারে না। কিন্তু যাহারা কাফিরী অবস্থায় পরলোকগমন করিয়াছে বলিয়া শরীয়তে উল্লেখ আছে, তাহাদিগকে লা'নত করা যাইতে পারে, যেমন, ফিরাউন, আবূ জেহেল প্রমুখ।

রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অতি অল্পসংখ্যক কাফিরের নাম লইয়া লা'নত করিয়াছেন। কারণ তিনি ওহী দ্বারা জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তাহারা মুসলমান হইবে না, বরং কাফিরী অবস্থায় পরলোকগমন করিবে। কোন য়াহূদীকে লা'নত করা সঙ্গত নহে, কেননা সে মৃত্যুর পূর্বে মুসলমান হইয়া লা'নতকারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া যাইতে পারে। কেহ হয়ত এ-স্থলে প্রতিবাদ করিয়া বলিতে পারে, কাফির যেমন মৃত্যুর পূর্বে মুসলমান হইতে পারে, তদ্রূপ মুসলমানও আল্লাহ্ না করুন ঈমান নষ্ট করিয়া কাফির হইয়া পরলোকগমন করিতে পারে। এমতাবস্থায়, 'তোমার উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হউক' এই আশীর্বাদ বাক্য কোন মুসলমানের জন্য সঙ্গত বলিয়া প্রমাণ করিতে যাইয়া যদি কেহ বলে যে, ইহা তৎকালীন অবস্থা সাপেক্ষ অর্থাৎ সেই ব্যক্তি যতক্ষণ মুসলমান থাকিবে ততক্ষণ রহমত বর্ষণের দোয়া তাহার উপর প্রযোজ্য হইবে, তবে কোন একজন কাফিরকে লা'নত করিলেও তৎকালীন অবস্থা সাপেক্ষ হইবে না কেন? অর্থাৎ সেই কাফিরও যতক্ষণ কাফির থাকিবে ততক্ষণ এই লা'নতের কুফল ভোগ করিবে। এইরূপ প্রতিবাদ ভ্রান্তিপূর্ণ ও অন্যায়। কারণ, কোন মুসলমানের উপর রহমত বর্ষণের দোয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাহাকে ঈমানের উপর দৃঢ়পদ রাখুন। অটল ঈমানই রহমতের ফল। এই অনুসারে ব্যক্তি বিশেষ কোন কাফিরের উপর লা'নত করার অর্থ এই হয় যে, আল্লাহ্ তাহাকে কাফিরীতে অবিচলিত রাখুন ও তাহাকে অনন্ত শাস্তির উপযুক্ত করিয়া লউন। সুতরাং কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম লইয়া লা'নত করা সঙ্গত নহে।

আবার কেহ যদি বলে, য়াযীদের উপর লা'নত করা উচিত; তবে আমরা বলিব, য়াযীদের নাম না লইয়া যদি বল– 'হযরত ইমাম হুসায়ন রাযিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারী বিনা তওবায় প্রাণ ত্যাগ করিয়া থাকিবে তাহার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত হউক', এতটুকু মাত্র সঙ্গত হইতে পারে। কারণ, কাফিরী অপেক্ষা নরহত্যার অপরাধ বিষমতর নহে। আর হযরত ইমাম হুসায়ন রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর হত্যাকারী তওবা করিয়া থাকিলে তাহাকে লা'নত করা সঙ্গত নহে।

লক্ষ্য কর, ওহ্‌শী নামক এক ব্যক্তি হযরত হাম্‌যা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুকে শহীদ করিয়াছিল এবং তৎপর সে মুসলমান হইল। সুতরাং তাহাকে আর লা'নত করা চলে না। য়াযীদের অবস্থা কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সে হযরত ইমাম হুসায়ন রাযিয়াল্লাহু আনহুকে শহীদ করিয়াছে বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। কেহ কেহ বলেন, য়াযীদ তাঁহাকে বধ করিবার আদেশ দিয়াছিল; আবার কেহ কেহ বলেন, সে আদেশ ত দেয় নাই, বরং বধ কাজে তাহার সম্মতি ছিল। সুতরাং সন্দেহ স্থলে কাহাকেও পাপের সহিত জড়িত করা চলে না। ইহা করাও একটি বিষম পাপ। বর্তমান সময়েও অনেক বুযুর্গকে লোকে শহীদ করিয়াছে। কিন্তু কেহই জানে না যে, কাহার নির্দেশে ইহা করা হইল। এমতাবস্থায়, চারিশত বৎসর পূর্বে হযরত ইমাম হুসায়ন রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর হত্যাকান্ডের প্রকৃত ঘটনা লোকে কিরূপে অবগত হইবে? আল্লাহ্‌ তাঁহার বান্দাগণকে বেহুদা কথন এবং এইরূপ নিরর্থক তথ্য সংগ্রহের বিপদ হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন।

কেহ সারা জীবনে শয়তানকে একবার লা'নত না করিলেও কিয়ামতের দিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে না– "শয়তানকে কেন লা'নত কর নাই?" কিন্তু কেহ অপরকে একবার লা'নত করিলেও প্রবল আশঙ্কা রহিয়াছে যে, কিয়ামতের দিন তজ্জন্য তাহাকে জওয়াবদিহি করিতে হইবে।

কোন একজন বুযুর্গ বলিয়াছেন– "কিয়ামত দিবস আমার আমলনামায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌' কলেমা দেখা যাইবে, না কাহারও প্রতি লা'নত দেখা যাইবে, এই ভাবনায় আমি ব্যাকুল রহিয়াছি। কিন্তু এই কলেমাই যেন দেখা যায়, এই আশাই আমি করিয়া থাকি।" এক ব্যক্তি রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন– "কাহাকেও লা'নত করিও না।" বুযুর্গগণ বলিয়াছেন– "কোন মুসলমানকে লা'নত করা তাহাকে বধ করার তুল্য।" অনেকে বলেন যে, এই মর্মে হাদীসও আছে। অতএব শয়তানের প্রতি লা'নতে ব্যাপৃত থাকা অপেক্ষা আল্লাহ্‌র যিকিরে লিপ্ত থাকা উত্তম। এমতাবস্থায়, কোন মানুষের প্রতি লা'নত করা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? কেহ অন্যকে লা'নত করিয়া তাহার ধর্ম সুদৃঢ় হইল বলিয়া মনে করিলে সে শয়তানের ধোঁকায় পতিত হইয়াছে। এইরূপ মনোভাব কুসংস্কার ও কুপ্রবৃত্তি হইতে জন্মিয়া থাকে।

সপ্তম আপদ—অপবাদ ও অযথা প্রশংসাসূচক কবিতা। ইতঃপূর্বে সঙ্গীত সম্বন্ধে বর্ণনাকালে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, কবিতা অবৈধ নহে; কেননা রাসূলে

মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সমক্ষে লোকে কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিল এবং তিনি হযরত হাস্‌সান রাযিয়াল্লাহ্‌ আন্‌হাকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরগণ যে সকল কবিতা লিখিত, উহার উত্তরে ব্যঙ্গ কবিতা লিখিতে আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু মিথ্যা বিষয়ে লিখিত বা কোন মুসলমানের অপবাদ বা অযথা প্রশংসাসূচক কবিতা পাঠ করা সঙ্গত নহে। কবিতায় সাদৃশ্য বা উপমা বর্ণনাকালে কিছু মিথ্যার আবেশ থাকিলেও ইহা অবৈধ নহে; কেননা, ইহাই কবিতার ধর্ম। লোকে ইহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করুক, কবি এই আশা করে না। সেইরূপ আরবী কবিতা রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সমক্ষে লোকে পাঠ করিয়াছিল।

অষ্টম আপদ—হাসিঠাট্টা ও কৌতুক করা। রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সর্বদা হাস্য-কৌতুক করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু মানসিক বিষন্নতা দূর করিবার উদ্দেশ্যে সময় সময় সামান্য ধরনের কৌতুক করাতে দোষ নাই। কৌতুক প্রদর্শনের প্রবৃত্তিকে একটি স্থায়ী অভ্যাস ও অর্থ উপার্জনের উপায়ে পরিণত করা না হইলে এবং সত্য কথা বলা হইলে ইহাকে শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। অতিরিক্ত কৌতুকে মূল্যবান সময় বৃথা নষ্ট হয় ও অধিক হাস্য-পরিহাস জন্মে। অধিক হাস্য-পরিহাসে মানবাত্মা মলিন হইয়া পড়ে। তাহার গাম্ভীর্য ও সম্মান হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং কোন কোন সময় লোকের মন বিগড়াইয়া বিবাদ-বিসম্বাদের সূচনা হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "আমি কৌতুক করি, কিন্তু সত্য ছাড়া কিছু বলি না।" তিনি অন্যত্র বলেন– "অপরের হাসির উদ্রেক করিবার জন্য কেহ কেহ কথা বলিয়া থাকে, কিন্তু ইহা দ্বারা সে তাহার স্বীয় মর্যাদা হইতে আকাশ হইতে পাতালের দূরত্ব অপেক্ষা অধিক নিম্নে অবতরণ করে। যাহা অধিক হাসির উদ্রেক করে তাহা মন্দ এবং মৃদু হাসি ব্যতীত অট্টহাস্য করা সঙ্গত নহে।" তিনি আরও বলেন– "আমি যাহা অবগত আছি, তাহা অবগত হইলে তোমরা অল্প হাসিতে এবং অধিক রোদন করিতে।"

এক বুযুর্গ জনৈক ব্যক্তিকে বলিলেন– "তুমি কি অবগত নও যে, অবশ্য অবশ্য একদিন দোযখের উপর দিয়া গমন করিতে হইবে? যেমন আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا ـ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ـ

অর্থাৎ "তোমাদের কাহারও উহাতে অবতরণ ব্যতীত অব্যাহতি নাই। ইহা তোমাদের প্রভুর দৃঢ় ও কৃতসিদ্ধান্ত" (সূরা মরিয়ম, রুকু ৫. পারা ১৬)। সেই ব্যক্তি বলিল– "হ্যাঁ, জানি।" তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন– "তুমি কি শ্রবণ করিয়াছ যে, দোযখ হইতে কেহ বাহির হইয়া আসিবে?" সে বলিল– "না।" তৎপর তিনি বলিলেন– "তবে মুখে হাসি দেখা যায় কেন? হাসিবার কি কারণ থাকিতে পারে?" হযরত আতায়ী সাল্‌মী (র) চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত হাসেন নাই। হযরত ওহাব ইব্‌নুল

ওরদ (র) কতিপয় লোককে ঈদের দিন হাসিতে দেখিয়া বলিলেন– "যদি আল্লাহ্ এই সকল লোককে মাফ করিয়া থাকেন এবং তাহাদের রোযা গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে তাহাদের কৃতজ্ঞ হওয়া আবশ্যক, হাস্য করা সঙ্গত নহে। আর যদি তাহাদের রোযা অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন, তবে তাহাদের রোদন করা উচিত, হাসিবার কোন কারণ নাই।" হযরত ইব্ন আব্বাস রাযিয়াল্লাহ্ আন্হু বলেন– "যে ব্যক্তি গোনাহ্ করে অথচ হাসে, সে দোযখে যাইয়া ক্রন্দন করিবে।" হযরত মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসি (র) লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন– "বেহেশ্তে কেহ রোদন করিলে অবাক হইবে কি?" তাহারা বলিল– "হাঁ, নিশ্চয়ই অবাক হইব।" তিনি বলিলেন– "যাহারা অবগত নহে, পরকালে তাহাদের স্থান কোথায় দোযখে কি বেহেশ্তে অথচ দুনিয়াতে হাস্য করে, তবে ইহা বেহেশ্তে রোদন অপেক্ষা অধিক অবাক কাণ্ড।"

হাদীস শরীফে আসিয়াছে, একদা জনৈক আরব পল্লীবাসী উষ্ট্র আরোহণে গমনকালে রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে সালাম দিল এবং নিকটবর্তী হইয়া তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা করিল; কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার উষ্ট্র পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। ইহাতে হযরতের সঙ্গীগণের কেহ কেহ হাসিতে লাগিলেন। অবশেষে উটটি স্বীয় পৃষ্ঠ হইতে সেই ব্যক্তিকে ফেলিয়া দিল এবং তৎক্ষণাত সে মরিয়া গেল। হযরতের সঙ্গীগণ তখন বলিলেন– "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ঐ ব্যক্তি উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।" তিনি বলিলেন– "হাঁ, তোমাদের মুখ তাহার রক্তে পরিপূর্ণ হইয়াছে" অর্থাৎ তাহাকে দেখিয়া তোমরা হাস্য করিতেছ। হযরত ওমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) বলেন– "আল্লাহ্কে ভয় কর এবং কখনও হাস্য-পরিহাস করিও না। ইহাতে অসদ্ভাব জন্মে এবং মন্দকাজ সংঘটিত হয়। লোক-সংসর্গে উপবেশন করিলে কুরআন শরীফের বিষয় আলোচনা কর, ইহা না পারিলে সাধু ব্যক্তিদের জীবনী ও পুণ্য কার্যের বর্ণনা কর।" হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহ্ আন্হু বলেন– "অন্যকে হাসিঠাট্টা করিলে লোকচক্ষে ঠাট্টাকারীর মানমর্যাদা থাকে না।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কৌতুক—রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সমস্ত জীবনে তাঁহার মুবারক মুখ হইতে সাহাবা রাযিয়াল্লাহ্ আন্হুম মাত্র দুই তিনটি কৌতুক বাক্য শ্রবণ করিয়াছেন। একদা তিনি এক বৃদ্ধাকে বলিলেন– "বৃদ্ধা বেহেশ্তে যাইবে না।" ইহাতে বৃদ্ধা কাঁদিতে লাগিল দেখিয়া তিনি বলিলেন– "হে বৃদ্ধে, নিরাশ হইও না, প্রথমে তোমাকে তরুণী বানানো হইবে, তৎপর তুমি বেহেশ্তে প্রবৃষ্ট হইবে।" এক রমণী রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট বলিল– "আমার স্বামী আপনাকে আহবান করিতেছেন।" তিনি বলিলেন– "সেই ব্যক্তিই কি তোমার স্বামী যাহার নয়নে শুভ্রতা আছে?" রমণী বলিল– "না, আমার স্বামীর নয়ন শুভ্র নহে।" তখন তিনি বলিলেন– "নয়নে শুভ্রতাশূন্য কোন লোক নাই।" এক রমণী রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া

সাল্লামের নিকট নিবেদন করিল– "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমাকে উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া লউন।" তিনি বলিলেন– "তোমাকে উটের বাচ্চার পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া লইব।" রমণী বলিল– "আমি উটের বাচ্চার পৃষ্ঠে আরোহণ করিব না; ইহা আমাকে ফেলিয়া দিবে।" তিনি বলিলেন– "যাহা উটের বাচ্চা নহে, এমন কোন উট নাই।" আবূ উমায়র নামে হযরত আবূ তাল্হা রাযিয়াল্লাহ্ আনহুর এক পুত্র ছিল। বালকটি নুগায়র নামক একটি পাখির ছানা পোষণ করিয়াছিল। বাচ্চাটি অকস্মাৎ প্রাণত্যাগ করিলে বালক কাঁদিতেছে দেখিয়া রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহাকে বলিলেন ঃ يَا اَبَا عُمَيْرُ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ অর্থাৎ "হে আবূ ওমায়র, নুগায়র কি হইল?"

অনেক সময় বালক ও রমণীদের সঙ্গে রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তদ্রূপ কৌতুক বাক্য বলিতেন যেন তাহারা আনন্দিত হয় এবং তাঁহার প্রতাপে ভীত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন না করে। স্বীয় সহধর্মিণীগণের আনন্দ বর্ধনের উদ্দেশ্যে তিনি মাঝে মাঝে কৌতুক করিতেন। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন– "একদা আমার সপত্নী হযরত সাওদা রাযিয়াল্লাহু আনহা আমার গৃহে আগমন করিলেন। আমি দুধ দিয়া এক বস্তু পাক করিয়াছিলাম। আমি তাঁহাকে কিছু খাইতে বলিলাম। কিন্তু তিনি সম্মত হইলেন না। আমি বলিলাম– 'না খাইলে তোমার মুখমণ্ডলে লেপন করিয়া দিব।' তিনি বলিলেন– 'আমি কখনও খাইব না।' আমি হস্ত প্রসারণ করত উক্ত বস্তু সামান্য তাঁহার মুখে মাখিয়া দিলাম। তখন রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাদের দুইজনের মধ্যে বসিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় পবিত্র হাটু সরাইয়া পথ করিয়া দিলেন যাহাতে তিনি (হযরত সাওদা) প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারেন। তিনিও উক্ত বস্তু আমার মুখে মাখাইয়া দিলেন। ইহাতে রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হাসিতে লাগিলেন।"

যাহ্হাক ইব্ন সুফিয়ান (রা) অত্যন্ত কদাকার পুরুষ ছিলেন। তিনি একদা রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট বসিয়াছিলেন। এমন সময় তিনি হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে শোনাইয়া বলিলেন– "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমার দুই স্ত্রী আছে; প্রত্যেকেই হযরত আয়েশা (রা) অপেক্ষা রূপবতী। আপনি ইচ্ছা করিলে একজনকে তালাক দিতে পারি, যাহাতে আপনি তাহাকে বিবাহ করিয়া লইতে পারেন।" যাহ্হাক ইহা কৌতুকস্বরূপ বলিতেছিলেন। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হা যাহ্হাককে জিজ্ঞাসা করিলেন– "আচ্ছা বল ত, তুমি তাহাদের অপেক্ষা অধিক সুন্দর, না, তাহারা তোমা অপেক্ষা অধিক সুন্দর?" যাহ্যাক বলিলেন– "আমি তাহাদের অপেক্ষা অধিক সুন্দর।" হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার প্রশ্ন শুনিয়া রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হাসিতে লাগিলেন; কেননা যাহ্হাক অত্যন্ত কদাকার ছিলেন। (পর্দা সম্বন্ধে আদেশ-নিষেধ অবতীর্ণ হইবার পূর্বে ঐ সকল কথাবার্তা হইয়াছিল)। সুআয়বকে খোরমা খাইতে দেখিয়া রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু

আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন– "তোমার চোখে বেদনা; আর তুমি খোরমা খাইতেছ?" তিনি উত্তর দিলেন– "আমি অপরদিকের মাড়ি দ্বারা খাইতেছি।"

খাওয়াত ইব্ন যুবায়র রমণীদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। একদা তিনি মক্কা শরীফের কোন পথে রমণীদের মধ্যে দণ্ডায়মান ছিলেন। এমন সময় রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলে তিনি খুব লজ্জিত হইলেন। হযরত (সা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন– "তুমি কি করিতেছ?" খাওয়াত বলিলেন– "আমার নিকট একটি অবাধ্য উট আছে; আমি এই স্ত্রীলোকদের দ্বারা ইহার জন্য একটি রজ্জু প্রস্তুত করাইতে চাই।" হযরত (সা) তখন তথা হইতে চলিয়া গেলেন। খাওয়াত বলেন– "তৎপর একদিন হযরত (সা) আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন– ' হে খাওয়াত, ঐ উট সংযত হইয়াছে কি?' আমি লজ্জিত হইয়া নীরব রহিলাম। ইহার পর তিনি আমাকে দেখিলেই এইরূপ প্রশ্ন করিতেন। পরিশেষে, একদা তিনি এক গর্দভের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পবিত্র পদযুগল এক পার্শ্বে দুলাইয়া আগমন করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন– 'হে খাওয়াত, সেই অবাধ্য উটের সংবাদ কি?' আমি নিবেদন করিলাম– 'সেই মহান আল্লাহ্‌র কসম, যিনি আপনাকে সত্য রসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছেন, যে-দিন আমি ঈমান আনিয়া মুসলমান হইয়াছি, সেইদিন হইতেই সে আর অবাধ্য রহে নাই।' ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ اهْدِ اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ -

অর্থাৎ 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবর, হে আল্লাহ্, আবূ আবদুল্লাহকে হিদায়ত কর।"

হযরত নো'মান আন্‌সারী রাযিয়াল্লাহু আনহু অধিক কৌতুক করিতেন। তাঁহার অভ্যাস এই ছিল যে, মদীনা শরীফের বাজারে কোন ফল আসিলে মূল্য ঠিক করিয়া ইহা রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সমীপে উপস্থিত করিয়া বলিতেন– 'উপঢৌকনস্বরূপ গ্রহণ করুন।' ফলে মালিক মূল্য চাহিলে তিনি তাহাকে হযরত (সা)-এর নিকট লইয়া যাইতেন এবং হযরত (সা)-এর দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেন– ' তোমার ফল তিনি খাইয়াছেন, মূল্য চাহিয়া লও।" হযরত (সা) হাসিয়া মূল্য দিতেন এবং হযরত নো'মান আন্‌সারী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুকে বলিতেন– "আচ্ছা বলত, তুমি ইহা আনয়ন করিলে কেন?" তিনি বলিতেন– "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমার নিকট মূল্য ছিল না, অথচ আপনি ব্যতীত অন্য কেহ যেন উহা আহার না করে, ইহাই আমার ইচ্ছা।"

রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সমগ্র জীবনে হযরত সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহ্ আনহুম তাঁহার যে কয়টি কৌতুক উল্লেখ করিয়াছেন, উহাই উপরে বর্ণিত হইল। উহাতে অসত্যের লেশমাত্রও নাই; কোন লোকের অন্তরেও কষ্ট দেওয়া হয় নাই এবং রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের

মান-মর্যাদাও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। মাঝে মাঝে এইরূপ কৌতুক করা সুন্নত; কিন্তু কৌতুক অভ্যস্ত হওয়া বৈধ নহে।

নবম আপদ—ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও উপহাস করিয়া অন্যের কণ্ঠস্বরের অনুকরণে কথা বলা বা গতিবিধি অনুযায়ী অঙ্গ-ভঙ্গিমা করত লোকের হাসির উদ্রেক করা। যাহাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা হয়, সে ইহাতে দুঃখিত হইলে উহা করা হারাম। আল্লাহ্ বলেন ঃ

لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ -

অর্থাৎ "একদল অন্য দলকে যেন উপহাস না করে, হইতে পারে যে তাহারা উহাদের অপেক্ষা উত্তম।" (সূরা হুজুরাত, রুকূ ২, পারা ২৬)। রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– " কোন ব্যক্তি স্বীয় গোনাহ্ হইতে তওবা করিলে সেই গোনাহ্ উল্লেখ করিয়া যদি অপর কেহ তাহার কুৎসা করে তবে কুৎসাকারী সেই গোনাহে জড়িত হইয়া মরিবে।" কেহ হঠাৎ বাতকর্ম করিলে ইহা লইয়া উপহাস করিতে নিষেধ করিয়া রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "যাহা মানুষ স্বয়ং করিয়া থাকে তজ্জন্য অপরকে উপহাস করিবে কেন?" তিনি অন্যত্র বলেন– "যে ব্যক্তি ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অন্যকে হাস্যাস্পদ করে, কিয়ামতের দিন ফেরেশতাগণ তাহাকে লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিবে। বেহেশতের দ্বার উন্মুক্ত করত তাহারা তাহাকে প্রবেশ করিতে বলিবে; কিন্তু সে নিকটবর্তী হইলে তাহাকে প্রবেশ করিতে দিবে না; সে ফিরিয়া যাইতে চাহিলে তাহারা আবার তাহাকে আহবান করিবে, (তাহার জন্য) দ্বিতীয় দ্বার খুলিবে; এই দুঃখ ও যাতনায় অস্থির হইয়া সে ইহাতে প্রবেশ করিতে চাহিবে; কিন্তু সে নিকটবর্তী হইলে তাহারা দ্বারা বন্ধ করিয়া দিবে। পরিশেষে সেই ব্যক্তির অবস্থা এইরূপ হইবে যে, তাহাকে আহবান করিলেও সে আর (বেহেশতে প্রবেশের জন্য) অগ্রসর হইবে না; কারণ, সে মনে করিবে যে, সকলেই তাহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও ঘৃণা করিতেছে।"

যদি ঠিকভাবে জানা যায় যে, যাহাকে উপহার ও হাস্যাস্পদ করা হইতেছে, সে কখনও তজ্জন্য দুঃখিত হইবে না তবে উহা হারাম নহে, বরং তখন উহাকে একপ্রকার কৌতুকস্বরূপই গণ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু সেই ব্যক্তি দুঃখিত হইলে এইরূপ কৌতুক হারাম হইবে।

দশম আপদ—মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "তিনটি এমন বিষয় আছে, যাহার একটিও কাহারও নিকট থাকিলে তাহাকে মুনাফিক বলিয়া গণ্য করা হইবে, যদিও সে নামায পড়ে এবং রোযা রাখে। সেই তিনটি জিনিস এই ঃ **প্রথম**– মিথ্যা কথা বলা, **দ্বিতীয়**– প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা ও **তৃতীয়**– আমানতে খিয়ানত অর্থাৎ গচ্ছিত দ্রব্য অপচয় করা।" তিনি অন্যত্র বলেন– "প্রতিশ্রুতি পালন করা অবশ্য কর্তব্য।" অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা সঙ্গত নহে। প্রতিশ্রুতি পালন সম্পর্কে হযরত ইসমাঈল আলায়হিস সালামকে প্রশংসা করিয়া আল্লাহ্ বলেন– اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ অর্থাৎ "প্রতিশ্রুতি পালনে তিনি নিশ্চয়ই

বড় সত্যনিষ্ঠ ছিলেন।" হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম একদা কোন এক ব্যক্তির সহিত এক নির্দিষ্ট স্থানে দেখা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে তিনি যথাস্থানে যাইয়া দেখেন, সেই ব্যক্তি আগমন করে নাই। প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য ঐ ব্যক্তির প্রতীক্ষায় তিনি সেই স্থানে বাইশ দিন পর্যন্ত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এক সাহাবী (রা) বলেন- "রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া আমি অমুক স্থানে উপস্থিত হইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম; কিন্তু (পরে) ভুলিয়া গেলাম। তৃতীয় দিবসে যাইয়া দেখি তিনি তথায় অবস্থান করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন-'ওহে যুবক, তিনদিন যাবত আমি তোমার পথের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছি।" রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলিলেন- "আমার সহিত আবার সাক্ষাত করিয়া যাহা প্রার্থনা করিবে তাহাই তোমাকে প্রদান করিব।" কিছুদিন পর তিনি খায়বারের জয়লব্ধ মাল বণ্টনকালে সেই ব্যক্তি বলিল- "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনি আমার নিকট এক প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ আছেন।" তিনি তাহাকে বলিলেন- "তোমার যাহা চাহিবার চাহিয়া লও।" সেই ব্যক্তি আশিটি ছাগল চাহিল এবং তিনি তৎক্ষণাত তাহাকে উহা দিয়া বলিলেন-"তুমি অত্যন্ত সামান্য জিনিস চাহিলে। যে রমণীর সংবাদে হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামের কবর পাওয়া গিয়াছিল, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম তাহাকে বলিয়াছিলেন- 'তুমি যাহা চাহিবে, আমি তাহাই দিব;' সেই রমনী তোমা অপেক্ষা অনেক অধিক ও উত্তম জিনিস চাহিয়াছিল। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম যখন তাহাকে বলিলেন- 'চাও, যাহা চাহিবে তাহাই দিব,' তখন সেই স্ত্রীলোক বলিল- 'আল্লাহ্ যেন পুনরায় আমাকে যৌবন দান করেন এবং আমি পরকালে যেন বেহেশ্‌তে বাস করিতে পারি।" তৎপর ঐ ছাগপ্রার্থী ব্যক্তি আরব দেশে একটি প্রবাদস্বরূপ হইল। লোকে বলিত- "অমুক ব্যক্তি ত আশি ছাগওয়ালা অপেক্ষা অধিক অল্পে পরিতুষ্ট।"

প্রতিশ্রুতির নিয়ম—অকাট্য প্রতিশ্রুতি যথাসম্ভব না দেওয়াই সঙ্গত। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কাহাকেও কোন কথা দিবারকালে এইরূপ বলিতেন- "ইহা করা আমার পক্ষে সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়।" প্রতিশ্রুতি দিলে আপ্রাণ চেষ্টায় ইহা রক্ষা করিবে। কিন্তু অপরিহার্য কারণে অনন্যোপায় হইয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে না পারিলে দোষ নাই। কেহ কোন স্থানে থাকিবার প্রতিশ্রুতি দিলে নামাযের সময় না হওয়া পর্যন্ত তথায় তাহার অবস্থান করা কর্তব্য বলিয়া বিদ্বানগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

কোন জিনিস কাহাকেও দান করার পর ইহা ফিরাইয়া লওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা অপেক্ষা মন্দ। যে ব্যক্তি প্রদত্ত বস্তু ফিরাইয়া লয় তাহাকে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এমন কুকুরের সহিত তুলনা করিয়াছেন, যে বমি করা বস্তু পুনরায় ভক্ষণ করে।

একাদশ আপদ—মিথ্যা বলা ও মিথ্যা শপথ করা। উহা কবীরা গুনাহ্। রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "কপটতার দ্বারসমূহের মধ্যে মিথ্যা অন্যতম দ্বার।" তিনি বলেন-"মানুষ ক্রমাগত মিথ্যা বলিতে থাকিলে আল্লাহ্‌র নিকট তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া লিপিবদ্ধ করা হয়।" তিনি আরও বলেন- "মিথ্যা বাক্যে মানবের উপজীবিকা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।" তিনি বলেন- "বণিকগণ দুরাচার পাপী।" লোকে জিজ্ঞাসা করিল- "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, কেন? বাণিজ্য কি বৈধ নহে?" তিনি বলিলেন- "তাহারা শপথ করিয়া পাপী হয় এবং মিথ্যা কথা বলে, এইজন্য (তাহারা দুরাচার পাপী)।" তিনি অন্যত্র বলেন- "যে ব্যক্তি লোককে হাসাইবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলে তাহার জন্য আফসোস, তাহার জন্য আফ্‌সোস, তাহার জন্য আফ্‌সোস।"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "এক ব্যক্তি আমাকে দণ্ডায়মান হইতে বলিল। আমি দণ্ডায়মান হইলাম। দুই ব্যক্তিকে দেখিলাম, একজন দণ্ডায়মান, অপরজন উপবিষ্ট। তৎপর দণ্ডায়মান ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তির মুখের ভিতরে একটি লোহার আকর্ষী প্রবেশ করাইয়া তাহারা চোয়াল এইরূপে আকর্ষণ করিতে লাগিল যে, চোয়াল স্কন্ধ পর্যন্ত নামিয়া আসিল। ইহার পর অপরদিকের চোয়াল সে তদ্রূপ আকর্ষণ করিয়া নামাইল; তখন প্রথম দিকের চোয়াল স্বীয় স্থানে চলিয়া গেল। এইরূপে বারবার সে উভয়দিকের চোয়ালে আকর্ষণ করিতে লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- এই ব্যক্তি কে?' সে বলিল- 'এই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী। কিয়ামত পর্যন্ত কবরে তাহাকে এইরূপ শাস্তি দিতে থাকিব।"

আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে জর্‌রাদ একদা রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন- "মুসলমান কি কখনও ব্যভিচার করিতে পারে?" তিনি বলিলেন- "(শয়তানের প্ররোচনায়) কখন হয়ত করিতেও পারে।" আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে জর্‌রাদ পুনরায় নিবেদন করিলেন- "মুসলমান মিথ্যাও বলিতে পারে কি?" হযরত (সা) বলিলেন- "কখনই না।" ইহা বলিয়া তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ "তাহারাই মিথ্যা বলিয়া থাকে যাহাদের ঈমান নেই।" হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আমের রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন- "একটি ছোট বালক খেলিতেছিল। আমি তাহাকে বলিলাম-'আস, আমি তোমাকে একটি জিনিস দিব।' তখন রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমার গৃহে ছিলেন। তিনি বলিলেন- 'তুমি তাহাকে কি দিবে?' আমি বলিলাম- 'খোরমা।' তিনি বলিলেন- 'কিছু না দিলে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া লেখা হইত।' তৎপর তিনি আরও বলিলেন- 'কবীরা গুনাহ্‌র মধ্যে কোন্‌গুলি সর্বাপেক্ষা ভীষণ তোমাকে জানাইয়া দিব কি? তন্মধ্যে ভীষণতমটি শিরক অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কোন ভাগী সাব্যস্ত করা, তৎপর মাতাপিতার আদেশ অমান্য করা।" এতক্ষণ রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন, তৎপর সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন- "সাবধান, মিথ্যা কথা বলাও একটি কবীরা গুনাহ্।"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- 'মিথ্যাবাদীর দুর্গন্ধে ফেরেশতাগণ এক মাইল দূরে চলিয়া যায়।" এইজন্যই কেহ কেহ বলিয়াছেন, কথা বলিবার সময় হাঁচি আসিলে ইহাকে সেই কথার সত্যতার প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কারণ হাদীস শরীফে আসিয়াছে- "ফেরেশতা হইতে 'হাঁচি' ও শয়তান হইতে 'হাই' তোলা হইয়া থাকে।" ঐ কথা মিথা হইলে ফেরেশ্‌তা উপস্থিত থাকিত না এবং হাঁচিও আসিত না। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন-"অপরের মিথ্যা বর্ণনা করাও মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত।" তিনি বলেন-"যে ব্যক্তি মিথ্যা অঙ্গীকার করিয়া অপরের মাল গ্রহণ করে সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌কে তাহার প্রতি রাগান্বিত দেখিতে পাইবে।" তিনি অন্যত্র বলেন- "মুসলমানের মধ্যে সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থাকা সম্ভবপর; কিন্তু খিয়ানত (অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা) এবং মিথ্যা উক্তি (তাহার মধ্যে) কখনও থাকিতে পারে না।"

মাইমূন ইব্‌নে শাবীর (র) বলেন- "একদা চিঠি লিখিবার সময় একটি মিথ্যা কথা মনে পড়িল। ইহা চিঠিতে লিখিয়া দিলে বেশ সুন্দর হইত। কিন্তু আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম যে, কিছুতেই ইহা লিখিব না। সেই সময় এক আকাশবাণী শুনিতে পাইলাম- 'ঈমানদারগণকে আল্লাহ্‌ ইহকালে প্রতিজ্ঞায় ও ঈমানে অবিচলিত রাখিয়া থাকেন।" হযরত ইব্‌নে সাম্মাক (রা) বলেন- "মিথ্যা কথা না বলাতে আমি কোন সওয়াব পাইব না' কারণ, মিথ্যাকে আমি নিতান্ত ঘৃণা করি বলিয়াই মিথ্যা বলি না।"

মিথ্যা অবৈধ হওয়ার কারণ—মিথ্যা কথন এই জন্য হারাম যে, ইহার কুপ্রভাব অতি সত্বর হৃদয়ে বিস্তার লাভ করে, ইহার আকার ও স্বভাব বিকৃত করিয়া ফেলে এবং ফলে আত্মা মলিন হইয়া পড়ে।

স্থানবিশেষে মিথ্যা কথন সঙ্গত—মিথ্যার প্রতি অন্তরে প্রগাঢ় ঘৃণা পোষণ করিয়া শরীয়তসম্মত অপরিহার্য দরকারবশত এবং উৎকৃষ্ট কল্যাণ আকাঙ্ক্ষায় মিথ্যা কথন হারাম নহে। কারণ মিথ্যার প্রতি ঘৃণা থাকিলে ইহার প্রভাব অন্তরের উপর পড়িতে পারে না এবং হৃদয় বিগড়াইয়া যায় না। আবার কোন উৎকৃষ্ট কল্যাণ আকাঙ্ক্ষায় মিথ্যা কথনে অন্তর মলিন ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতে পারে না। কোন যালিমের হস্ত হইতে কোন মুসলমান পলায়ন করিলে তাহার সন্ধান অবগত থাকা সত্ত্বেও প্রকাশ করা সঙ্গত নহে। বরং নিতান্ত অনিবার্য হইলে এইরূপ স্থলে মিথ্যা বলাই আবশ্যক।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তিন স্থানে মিথ্যা বলার অনুমতি দিয়াছেন; যথা ঃ-(১) জিহাদে শত্রুপক্ষ হইতে নিজেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য লুকাইয়া রাখিতে; (২) ঝগড়ায়রত দুই দল বা ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসার উদ্দেশ্যে একপক্ষের উক্তি অপ্রীতিকর হওয়া সত্ত্বেও অপরপক্ষের নিকট প্রিয় আকারে উপস্থাপিত করিতে এবং (৩) কাহারও দুই জন সহধর্মিণী থাকিলে স্বামীকে উভয়ের নিকট 'তোমাকে আমি অধিক ভালবাসি' এইরূপ বলিতে।

কোন যালিম অন্যের ধন বা গোপনীয় বিষয় জানিতে চাহিলে ইহা গোপন রাখা বৈধ। কেহ তোমার গুনাহ্‌ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তুমি যদি ইহা অস্বীকার কর তবে কোন দোষ নাই; কারণ গুনাহ্‌ গোপন রাখিবার জন্য শরীয়তে আদেশ রহিয়াছে। স্ত্রীকে কোন দ্রব্য দিবার প্রতিশ্রুতি না দিলে সে কিছুতেই বশীভূত হইতেছে না, এমতাবস্থায়, সেই দ্রব্য প্রদানে স্বামী অসমর্থ হইলেও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়াতে কোন দোষ নাই। যে সকল স্থানে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা যাইতে পারে উহা উপরে বর্ণিত হইল।

বাস্তবপক্ষে, মিথ্যা কথন কখনও সঙ্গত নহে। কিন্তু সত্য বলিলে যদি এমন কোন অপ্রীতিকর বিষয় ঘটে যাহা শরীয়তে নিষিদ্ধ তবে বিচার ও বিবেচনার নিক্তিতে ওজনে করিয়া লইবে। দেখিবে যে, মিথ্যা কথনের দোষ অধিক, না সত্য কথায় শরীয়তের অপ্রিয় ঘটনা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাহা অল্প বলিয়া মনে হইবে তাহাই অবলম্বন করিবে। যেমন লোকজনের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিরহ, অযথা ধনের অপব্যয়, গোপন তত্ত্ব প্রকাশ ও গুনাহ্‌র জন্য অমর্যাদা সত্য কথনের দরুন হইলে, এইরূপ স্থানসমূহে মিথ্যা বলার বিধান আছে। কারণ শরীয়তের বিধানমতে ঐ স্থানসমূহে মিথ্যা কথনে যে অনিষ্ট হইতে পারে, উল্লিখিত অপ্রীতিকর বিষয়াদি হইতে তদপেক্ষা ভীষণ অনিষ্ট হইয়া থাকে। উক্ত স্থানসমূহে মিথ্যা বলার বিধানকে প্রাণ রক্ষার উদ্দেশ্যে মৃত প্রাণীর গুশ্‌ত খাওয়ার বিধানের ন্যায় বৈধ বলিয়া গণ্য করা হয়; কেননা মৃত প্রাণীর গুশ্‌ত ভক্ষণে নিরস্ত থাকা অপেক্ষা প্রাণ রক্ষা করাকে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গিতে অধিক দরকারী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। উল্লিখিত স্থানসমূহ ব্যতীত অন্য কোন স্থানে মিথ্যা বলা বৈধ নহে। ধন, যশ, ক্ষমতা ও প্রভুত্বের বড়াই এবং আত্ম-প্রশংসা করিতে যাইয়া মিথ্যা বলা সম্পূর্ণরূপে হারাম।

হযরত আস্‌মা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বলেন-"এক রমণী রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিল- 'আমার স্বামী আমার প্রতি ভালবাসা প্রদর্শনের নিমিত্ত যাহা করেন নাই ইহা আমার সপত্নীকে উৎপীড়নের উদ্দেশ্যে বলা উচিত কি না?' তিনি বলিলেন-'যাহা ঘটে নাই এইরূপ বিষয় যে নিজের উপর আরোপ করে, সে এমন ব্যক্তিসদৃশ যে প্রতারণার দুপাট্টা কাপড় পরিধান করে।" এই উক্তির মর্ম এই, সেই ব্যক্তি স্বয়ং মিথ্যা বলে এবং অপরকে ভ্রান্তিতে নিপতিত করিয়া তাহাকে ইহার পুনরুক্তির মিথ্যায় জড়িত করিয়া ফেলে।

বালকদিগকে মক্তবে প্রেরণের উদ্দেশ্যে কোন বস্তু প্রদানের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিলে কোন দোষ হইবে না। হাদীস শরীফে আসিয়াছে- "মিথ্যা কথাও লিখিত হয় এবং নির্দোষ মিথ্যাও লিখিত হয়। তৎপর (বিচারের সময়) জিজ্ঞাসা করা হইবে-'কেন মিথ্যা বলিয়াছিলে?' ইহার উত্তরে সে সন্তোষজনক কারণ প্রদর্শন করিতে পারিলে ঐ মিথ্যা নির্দোষ বলিয়া পরিগণিত হইবে।" ঠিকভাবে অবগত না হইয়া কাহাকেও কোন সংবাদ প্রদান করা নিষিদ্ধ। তদ্রূপ কেহ কোন মস্‌আলা জিজ্ঞাসা করিলে ভালরূপে

প্রকৃত সত্য অবগত না হইয়া উত্তর দেওয়া হারাম। অজ্ঞতা প্রকাশ পাইলে জ্ঞানের অহংকার ও সুখ্যাতি লাঘবের আশঙ্কায় কোন কোন লোক এইরূপ করিয়া থাকে।

কোন কোন আলিম বলেন- দানের আদেশ করত ইহার সওয়াব বর্ণনা করিতে যাইয়া মিথ্যা উক্তিকে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হাদীস বলিয়া প্রকাশ করাতে কোন দোষ নাই, অথচ ইহাও হারাম; কেননা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "আমার সহিত মিথ্যা জড়িত করিও না। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার সহিত মিথ্যা জড়িত করিবে সে দোযখে স্বীয় স্থান তালাশ করিয়া লউক।"

ব্যাজবাক্য—বুযুর্গগণের ঐরূপ আবশ্যকতা দেখা দিলে তাঁহারা মিথ্যা না বলিয়া ব্যাজবাক্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। এইরূপ বাক্যে তাঁহারা সত্য ব্যতীত মিথ্যা বলেন না বটে, কিন্তু শ্রবণকারী যাহা মনে করে বক্তার কথার উদ্দেশ্য ইহা থাকে না। এইরূপ কথাকে মা'আরীয বা ব্যাজবাক্য বলে।

হযরত মুতাররাফ (র) এক আমীরের নিকট গমন করিলে সে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল- "আপনি এত কম আসেন কেন?" তিনি বলিলেন- "আপনার নিকট হইতে প্রত্যাবর্তনের পর আমি শয্যা গ্রহণ করি। তৎপর আল্লাহ্ শক্তি দিলে উঠিলাম।" ইহা শ্রবণে আমীর বুঝিল, তিনি অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু তিনি অসুস্থ ছিলেন না, অথচ তিনি মিথ্যা বলেন নাই। হযরত শা'বীকে (র) কেহ আহ্বান করিলে তিনি তাঁহার পরিচারিকাকে নির্দেশ দিতেন-"গৃহ দ্বারে একটি বৃত্ত অঙ্কন করত ইহাতে অঙ্গুলি রাখিয়া বলিও- 'এইখানে নাই।' অথবা বলিও-'মস্‌জিদে তালাশ কর।"

হযরত মুআ'য রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু তহ্‌শীলের কার্য হইতে গৃহে ফিরিলে তাঁহার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন-"এতদিন হযরত ওমর (রা)-এর তহ্‌শীলদারী করিয়া গৃহে ফিরিলে, আমার জন্য কি আনয়ন করিয়াছ?" তিনি বলিলেন- "প্রহরী আমার সাথে ছিল বলিয়া কিছুই আনিতে পারি না।" তিনি আল্লাহ্‌কে উদ্দেশ্য করিয়া এস্থানে 'প্রহরী' শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার পত্নী মনে করিয়াছিলেন হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু তাঁহার কার্যে পাহারা দেওয়ার জন্য কোন প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছেন। তৎক্ষণাত তাঁহার পত্নী হযরত ওমার রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর গৃহে গমন করিয়া বলিলেন-"মুআ'য রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর নিকট বিশ্বস্ত আমানাতদার ছিলেন; আপনি তাঁহার কার্যে পাহারা দেওয়ার জন্য প্রহরী নিযুক্ত করিলেন কেন?" হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু হযরত মুআ'য রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুকে আহ্বান করিয়া উক্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। ইহা শ্রবণে হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু হাসিতে লাগিলেন এবং তাঁহার পত্নীর জন্য কিছু প্রদান করিলেন।

নিতান্ত আবশ্যকতা দেখা দিলেই ঐরূপ ব্যাজবাক্য প্রয়োগের বিধান রহিয়াছে। আবশ্যকতা না থাকিলে সত্য হইলেও ব্যাজবাক্য প্রয়োগে কাহাকেও ধোঁকায় ফেলা

জায়েয নহে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে ওত্‌বা (র) বলেন- "একদা পিতার সহিত হযরত ওমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (র)-এর নিকট গিয়াছিলাম। পিতা উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করিয়া বাহিরে আসিলেন। লোকে বলিতেছিল-'খলীফা সেই পোশাক তাঁহাকে উপহারস্বরূপ দিয়াছেন।' আমি বলিলাম-'আল্লাহ্ খলীফার কল্যাণ করুন।' পিতা বলিলেন- 'বৎস, মিথ্যা বা মিথ্যাতুল্য কথা বলিও না।" অর্থাৎ উক্ত বাক্য মিথ্যাতুল্য।

স্থানবিশেষে মিথ্যাতুল্য কথা নির্দোষ—মিথ্যাতুল্য কথা প্রয়োজনীয়তাবশত নির্দোষ বলিয়া পরিগণিত হয়। কৌতুকে ও অন্যের বিষণ্ন বদনে আনন্দ সঞ্চারের জন্য মিথ্যাতুল্য বাক্য প্রয়োগ বৈধ; যেমন রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন- "বৃদ্ধা বেহেশ্‌তে গমন করিবে না", "তোমাকে উটের বাচ্চার পৃষ্ঠে আরোহণ করাইব" এবং "তোমার স্বামীর চোখে শুভ্রতা আছে।" কিন্তু কাহারও কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিলে উহা বৈধ নহে। মনে কর, এক বক্তি বলিল-"অমুক রমণী তোমার প্রতি আসক্ত।" এইরূপ মিথ্যা বলিয়া কাহাকেও ধোঁকা দেওয়া সঙ্গত নহে; কারণ, ইহাতে তাহার মন ঐ রমণীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে পারে। কোন ক্ষতির আশঙ্কা না থাকিলে শুধু কৌতুকের উদ্দেশ্যে মিথ্যাতুল্য কথা বলাতে কোন পাপ না হইলেও কৌতুককারীকে পূর্ণ ঈমানের উন্নত সোপান হইতে অবতরণ করিতে হইবে। এই সম্বন্ধে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "যে পর্যন্ত মানুষ নিজের অপ্রিয় বস্তুকে অপরের জন্যও অপ্রিয় মনে না করিবে এবং মিথ্যা কৌতুক হইতে বিরত না থাকিবে সেই পর্যন্ত তাহার ঈমান পূর্ণতা লাভ করে না।"

সচরাচর মিথ্যার উদাহরণ—লোকে সাধারণত বলে-"তোমাকে শতবার তালাশ করিয়াছি" এবং "শতবার তোমার গৃহে গমন করিয়াছি" এইরূপ উক্তি অবৈধ নহে। কারণ, এইরূপ স্থানে 'শত' শব্দের উদ্দেশ্য সংখ্যা নিরূপণ নহে, বরং 'বহু' অর্থ বুঝাইতে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। সেই ব্যক্তি অনেকবার তালাশ না করিয়া বা অনেকবার না গিয়া 'শতবার' বলিলে মিথ্যা হইবে। মানুষের এইরূপ অভ্যাসও আছে যে, কেহ অপরকে কিছু ভক্ষণ করিতে বলিলে সে বলে- "আহার করিবার আমার ইচ্ছা নাই।" কিন্তু তাহার আহারে ইচ্ছা থাকিলে সেইরূপ বলা সঙ্গত নহে।

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হার সহিত রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শুভ বিবাহ রজনীতে তিনি এক পাত্র দুগ্ধ স্ত্রীলোকদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন। ক্ষুধা নাই বলিয়া দুগ্ধ পানে তাঁহারা অসম্মতি জানাইলে তিনি বলিলেন- "মিথ্যা ও ক্ষুধা এক সাথে একত্র করিও না।" তাঁহারা বলিলেন- "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, এতটুকু বলিলেও মিথ্যা বলা হইবে?" হযরত সাঈদ ইব্‌নে মুসাইয়িব (র)-এর চক্ষু পীড়িত হইয়াছিল। চক্ষে ময়লা দেখিয়া লোকে বলিল- "ময়লা মুছিয়া ফেলিলে কি ভাল হইত না?" তিনি বলিলেন- "চিকিৎসকের নিকট কথা দিয়াছি যে,

চক্ষে হস্ত লাগাইবে না; সুতরাং ময়লা মুছিলে আমার বাক্য মিথ্যা হইয়া যাইবে।" হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম বলেন- "মিথ্যা বাক্য লইয়া আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রাখিয়া যদি কেহ বলে যে, আল্লাহ্ অবগত আছেন, ইহা এইরূপ; তবে উহাও মহাপাপ।"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "যে ব্যক্তি মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে কিয়ামত দিবসে সে যবের দানাতে গ্রন্থিবন্ধন করিতে আদিষ্ট হইবে।"

দ্বাদশ আপদ—গীবত বা অসাক্ষাতে অপরের নিন্দা করা। রসনা ইহাতেই অধিকাংশ সময় লিপ্ত থাকে। আল্লাহ্ যাহাদিগকে রক্ষা করেন, কেবল তাহারাই এই আপদ হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকে। গীবত মানবাত্মার এক ভীষণ বিপদ। এই সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন- "যে ব্যক্তি গীবত করে সে যেন স্বীয় মৃত ভ্রাতার গুশ্‌ত ভক্ষণ করে" (সূরা হুজুরাত, রুকু ১২, পারা ২৬)। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "গীবত হইতে দূরে থাক, কেননা গীবত ব্যভিচার হইতে মন্দ।" ব্যভিচার করিয়া অনুতাপের সহিত তওবা করিলে আল্লাহ্ মাফ করিয়া দিতে পারেন; কিন্তু নিন্দিত ব্যক্তি মাফ না করিলে গীবতের পাপ মাফ হয় না। তিনি অন্যত্র বলেন- "মি'রাজের রাত্রে আমি কতকগুলি লোকের নিকট দিয়া গমনের সময় দেখিলাম তাহারা স্বীয় মুখমণ্ডলের গুশ্‌ত নখ দ্বারা ছিন্ন করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- 'তাহারা কোন্ লোক?' উত্তর হইল, 'তাহারা গীবত করিত।"

হযরত সুলায়মান ইব্‌নে জাবির রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন- "আমি রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিলাম- 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্, যাহা আমার সহায়ক হইবে আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দান করুন।' তিনি বলিলেন- 'সৎকাজকে (ইহা যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন) এমনকি তোমার বাল্‌তি হইতে অপরকে এক পেয়ালা পানি দান হইলেও, তুচ্ছ মনে করিবে না; মুসলমান ভ্রাতার সহিত প্রসন্ন বদনে মিলিবে এবং সে তোমার নিকট হইতে চলিয়া গেলে নিন্দা করিবে না।" হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের নিকট ওহী অবতীর্ণ হইয়াছিল- "যে ব্যক্তি গীবত হইতে তওবা করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে, সে সকলের শেষে বেহেশ্‌তে যাইবে; কিন্তু যে ব্যক্তি তওবা ব্যতীত প্রাণত্যাগ করিবে সে সর্বাগ্রে দোযখে নিক্ষিপ্ত হইবে।"

হযরত জাবির রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন- "একবার আমি রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সহিত সফরে ছিলাম। দুইটি কবরের নিকট দিয়া গমনের সময় তিনি বলিলেন-'এই দুই ব্যক্তি শাস্তি ভোগ করিতেছে, তন্মধ্যে একজন গীবতের অপরাধে ও অন্যজন স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র পেশাব হইতে পবিত্র রাখিত না বলিয়া শাস্তি পাইতেছে।' এই বলিয়া তিনি বৃক্ষের একটি তাজা ডাল ভাঙ্গিয়া দুই টুকরা করিয়া উক্ত দুই কবরের উপর পুঁতিয়া দিলেন এবং বলিলেন- 'এই ডাল শুকাইয়া না যাওয়া পর্যন্ত তাহাদের উপর শাস্তি লঘু হইবে।"

ব্যভিচার করিয়াছে বলিয়া এক ব্যক্তি স্বীকার করিলে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহাকে প্রস্তারাঘাতে বধ করিবার আদেশ দিলেন। সমবেত

লোকদের মধ্যে একজন অন্যজনকে বলিল- "কুকুরকে যেভাবে বসানো হয় তাহাকে সেভাবে বসানো হইয়াছে।" তৎপর রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সঙ্গিগণসহ গমনকালে একটি মৃত প্রাণী দেখিয়া তাহাদিগকে বলিলেন- "এই মৃতের মাংস ভক্ষণ কর।" সঙ্গিগণ নিবেদন করিলেন- "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, মৃতের মাংস কিরূপে ভক্ষণ করিব ?" তিনি বলিলেন-"ঐ (মৃত) ভ্রাতার যে মাংস তোমরা ভক্ষণ করিয়াছ, তাহা ইহা অপেক্ষা অধিক মন্দ ও পুতিগন্ধময়।" এই স্থানে তিনি গীবতকারীর সঙ্গে গীবত শ্রবণকারীকেও দোষী করিয়াছেন, কেননা শ্রবণকারীরাও পাপের অংশী হইয়া থাকে।

হযরত সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুম প্রসন্ন বদনে পরস্পর সাক্ষাত করিতেন এবং কেহ কাহারও গীবত করিতেন না। এইরূপ আচরণকে তাঁহারা শ্রেষ্ঠতম ইবাদত বলিয়া মনে করিতেন এবং উহার বিরুদ্ধাচরণকে কপটতা বলিয়া গণ্য করিতেন।

হযরত কাতাদাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন- "কবরের আযাব তিন ভাগে বিভক্ত- এক-তৃতীয়াংশ গীবত, এক-তৃতীয়াংশ অপরের বাক্যে দোষ ধরিয়া সমালোচনা এবং এক-তৃতীয়াংশ পরিধেয় বস্ত্র পেশাব দ্বারা অপবিত্র রাখা হইতে হইয়া থাকে।" একদা হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম শিষ্যগণসহ চলিবারকালে পথে একটি মৃত কুকুর দেখিতে পাইলেন। ইহার দুর্গন্ধে তাঁহারা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি কুকুরটির মাঢ়ির গুণকীর্তন করিয়া বলিলেন- "ইহার দাঁতের শুভ্রতা খুব চমৎকার" এবং তাঁহার সহচরগণকে উপদেশ দিতে লাগিলেন- "কোন পদার্থ দর্শন করিলে ইহার উৎকৃষ্ট অংশ সম্পর্কে কথা বলিবে।" হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের সম্মুখ দিয়া একদা একটি শূকর যাইতেছিল। তিনি ইহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন- 'নিরাপদে চলিয়া যাও।" তাঁহার শিষ্যগণ বলিলেন- "ইয়া রূহুল্লাহ্, শূকরের প্রতি আপনি এইরূপ মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন?" তিনি বলেন- "মিষ্ট বাক্য প্রয়োগে স্বীয় রসনাকে অভ্যস্ত করিতেছি।" হযরত আলী ইব্‌নে হুসায়ন রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা এক ব্যক্তিকে গীবতে লিপ্ত দেখিয়া বলিলেন- "নীরব থাক, গীবতকারী নরকবাসী কুকুরের তরকারীস্বরূপ।"

গীবতের পরিচয়—যাহা শুনিলে অপ্রিয় মনে হইবে, কাহারও সম্বন্ধে তাহার অনুপস্থিতিতে এমন কোন কথা বলাকেই গীবত বলে। এইরূপ কথা নিতান্ত সত্য হইলেই গীবত বলিয়া গণ্য হয়; আর অসত্য হইলে ইহাকে মিথ্যা অপবাদ বলে। অপরের দোষের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যে কথা বলা হয়, ইহাই গীবত। অন্যের দেহ, বংশ, বসনভূষণ, পশু, গৃহ, ভাবভঙ্গি বা কথোপকথনে কোন দোষ বাহির করিয়া কিছু বলিলে উহাকেই গীবত বলে।

দীর্ঘ দেহবিশিষ্ট লোককে লম্বা বলিলে, অথবা তদ্রূপ খর্ব, কাল বা উজ্জ্বল, কটাচক্ষু, বা টেরা প্রভৃতি বলিলে দেহ সম্বন্ধে গীবত হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তিকে গোলাম, জোলা বা অন্য কোন হীন পেশাদারের সন্তান বলিলে তাহার বংশ সম্বন্ধে

গীবত করা হয়। কাহাকেও নিন্দুক, মিথ্যাবাদী, গর্বিত, উগ্রবক্তা, কাপুরুষ বা অলস ইত্যাদি বলিলে তাহার প্রকৃতি সম্বন্ধে গীবত করা হয়। যদি কাহাকেও বল যে, সে চোর, আত্মসাৎকারী, বিশ্বাসঘাতক, বেনামাযী, রুকু-সিজদা পূর্ণভাবে আদায় করে না, কুরআন শরীফ ভুল পড়ে, বস্ত্র পবিত্র রাখে না, যাকাত আদায় করে না, হারাম ভক্ষণ করে, জিহবা সংযত রাখে না, অতিরিক্ত আহার করে, অধিক নিদ্রা যায়, স্বীয় অবস্থা অনুযায়ী চলিতে পারে না ইত্যাদি, তবে তাহার ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে গীবত করিলে। কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে যদি বল যে, তাহার আস্তিন শ্লথ, আঁচল দীর্ঘ, বস্ত্র মলিন ইত্যাদি, তবে তাহার বসন-ভূষণ সম্বন্ধে গীবত করা হইল।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "কাহারও সম্বন্ধে (তাহারা অগোচরে) এমন কোন কথা যদি বল যাহা শ্রবণ করিলে তাহার নিকট অপ্রীতিকর বোধ হয়, তবে সেই কথা সত্য হইলেও গীবত।" হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বলেন- "আমি একদা এক রমণীকে খর্বাকৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলাম। ইহা শুনিয়া রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন- "হে আয়েশা, তুমি গীবত করিলে; থুথু ফেল। আমি তৎক্ষণাত থুথু ফেলিয়া দেখিলাম ইহাতে কালবর্ণ রক্ত রহিয়াছে।"

কোন কোন লোকে বলে পাপীর পাপ কর্মের উল্লেখ করিলে গীবত হয় না; বরং তাহাদের গর্হিত কাজের জন্য তাহাদিগকে নিন্দা ও দোষারোপ করা ধর্মকর্মের অন্তর্ভুক্ত। তাহাদের এই ধারণা অসত্য ও ভ্রান্তিমূলক। অমুক ব্যক্তি ব্যভিচারী, মদ্যপায়ী বা বেনামাযী ইত্যাদি বলিয়া অপরের পাপ প্রকাশ করা নিতান্ত গর্হিত কার্য। তবে বিশেষ বিশেষ কারণে এইরূপ বলা অসঙ্গত নহে। ইহার বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে করা হইবে। রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উক্তির মর্ম এই- যাহা সম্মুখে বলিলে মনে বিরক্তি ও কষ্ট আসে, অগোচরে তাহা বলিলেই গীবত হয়। অপ্রীতিকর বাক্য শ্রবণে মানুষের মনে কষ্ট হইয়া থাকে। ফল কথা, যে উক্তিতে কোন উপকারিতা নাই তাহা ব্যক্ত না করাই সঙ্গত।

অঙ্গভঙ্গি ও রসনায় গীবত—শুধু রসনা দ্বারাই গীবত হয় না; বরং চক্ষু, হস্ত এবং ইঙ্গিত দ্বারাও গীবত হইয়া থাকে। সকল প্রকার গীবতই হারাম।

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বলেন- "আমি হাতের ইশারায় প্রকাশ করিয়াছিলাম, অমুক রমণী খর্ব। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন- "হে আয়েশা, তুমি গীবত করিলে।" সেইরূপ কোন খঞ্জ বা টেরা চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তির চলন ও চাহনির অনুসরণে কেহ খোড়াইয়া চলিলে বা টেরাচক্ষে চাহিলে তাহাদের গীবত করা হয়। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের নাম উল্লেখ না করিয়া সাধারণভাবে যদি বলা হয়, খঞ্জ ব্যক্তি এইরূপে হাটে, টেরাচক্ষু ব্যক্তি এইরূপে দর্শন করে, তবে গীবত হইবে না। আবার ঐরূপ অঙ্গভঙ্গিতে দর্শকগণ যদি বুঝিতে পারে যে, অমুক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করা হইতেছে, তবে উহা অবৈধ। কারণ, যে কোন

প্রকারেই হউক না কেন, নিন্দিত ব্যক্তিকে পরিচিত করাইয়া দিয়া দোষ ব্যক্ত করিলেই গীবত হয়।

অপরিপক্ক আলিম ও পরহেযগারদের গীবত—অপরিপক্ক আলিম ও দীনদার ব্যক্তিগণও গীবত করিয়া থাকেন। অথচ তাঁহারা যে গীবত করিতেছেন উহা তাঁহারা অবগত নহেন। উদাহরণস্বরূপ ধর, এইরূপ ব্যক্তির সম্মুখে কাহারও উল্লেখ হইল। তিনি তৎক্ষণাত বলিয়া উঠিলেন- "আলহামদুলিল্লাহ, খোদা আমাদিগকে সেইরূপ কার্য হইতে রক্ষ করিয়াছেন।" দোষীর দোষ লোকের নিকট ব্যক্ত করাই তাঁহার এইরূপ উক্তির উদ্দেশ্য। আবার তিনি এইরূপও বলেন- অমুক ব্যক্তি বড় ভাগ্যবান; কিন্তু আমাদের ন্যায় সেও সংসারে লিপ্ত রহিয়াছে। এই আপদ হইতে নিজকে রক্ষা করিতে পারিলেই হইল।" কোন কোন সময় তাঁহারা নিজদিগকে এইরূপ তিরস্কার করেন যাহাতে পরোক্ষভাবে অপরের নিন্দা হইয়া থাকে। আবার মনে কর, তাঁহার সম্মুখে একে অন্যের নিন্দা করিতে লাগিল। ইহা শুনিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন- "সুবহানাল্লাহ, কি চমৎকার।" নিন্দুককে সন্তুষ্ট করা ও ইতঃপূর্বে যাহারা ঐ নিন্দা শুনে নাই তাহাদের নিকট ইহা প্রকাশের জন্যই এইরূপ বলা হইয়া থাকে। কখনও আবার অন্যের প্রসঙ্গ উঠিলে তিনি বলেন- "আল্লাহ্ আমাদিগকে তওবা করিবার ক্ষমতা দিন।" উল্লিখিত ব্যক্তির কোন পাপ অপরকে জ্ঞাপন করাই এইরূপ উক্তির উদ্দেশ্য। এই প্রকার সমস্ত উক্তিই গীবতের মধ্য গণ্য।

কপটতাসংযুক্ত গীবত—অপরিপক্ক আলেম ও পরহেযগারদের ঐ প্রকার গীবতে কপটতাও রহিয়াছে। তদ্রূপ বাক্যে একদিকে নিজের পরহেযগারী ব্যক্ত করা হয় এবং অপরদিকে কপটতার আচ্ছাদনে গীবত লুক্কায়িত রাখিয়া প্রকাশ করা হয় যে, তিনি গীবত করেন না। ইহাতে দ্বিগুণ পাপ হইয়া থাকে, অথচ তিনি যে গীবত করিতেছেন অজ্ঞতার দরুন ইহা বুঝিতেই পারেন না। এইরূপও হইয়া থাকে যে, একে অন্যের নিন্দা করিতেছে শুনিয়া তুমি তিরস্কার করিয়া বলিলে- "চুপ কর, গীবত করিও না।" এমতাবস্থায়, গীবতের প্রতি তোমার প্রকৃত অবজ্ঞা না থাকিলে তুমি মুনাফিক হইলে। অপরপক্ষে, শ্রোতৃমণ্ডলী তোমার তিরস্কারের কারণ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে নিন্দিত ব্যক্তির দোষ আরও অধিক প্রকাশিত হইয়া পড়িবে এবং এইরূপে তুমি নিন্দুকও হইবে।

গীবত শ্রবণে গুনাহ্—গীবত করা যেমন হারাম, ইহা শ্রবণ করাও তেমনি হারাম। সুতরাং যে ব্যক্তি গীবত শ্রবণ করে সেও গীবতের পাপের অংশী হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রবণকারীর অন্তরে গীবতের প্রতি তীব্র ঘৃণা থাকিলে কোন দোষ নাই। একদা হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা এক সঙ্গে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এমন সময় একজন অপরজনকে বলিলেন- "অমুক ব্যক্তি অতিরিক্ত নিদ্রা যায়।" তৎপর তাঁহারা রুটি খাইবার জন্য তরকারি চাহিলে রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন- "তোমরা উভয়েই ত তরকারি খাইয়াছ।"

তাঁহারা বলিলেন- "কি খাইয়াছি, আমরা জানি না।" তিনি বলিলেন- "তোমরা স্বীয় ভ্রাতার মাংস খাইয়াছ।" লক্ষ্য কর, 'অমুক ব্যক্তি অতিরিক্ত নিদ্রা যায়' একজন বলিয়াছিলেন এবং অপরজন শ্রবণ করিয়াছিলেন অথচ রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উভয়কেই গীবতের অপরাধী করিলেন।

গীবত শ্রবণকারীর কর্তব্য—গীবতের প্রতি প্রগাঢ় ঘৃণা জাগরুক রাখিয়া গীবতকারীকে গীবত করিতে স্পষ্টাক্ষরে নিষেধ করা আবশ্যক। গীবতের প্রতি তোমার গভীর ঘৃণা থাকিলেও তুমি যদি তাহাকে চক্ষু বা হস্তের ইঙ্গিতে গীবত হইতে ক্ষান্ত থাকিতে বল, তথাপি তুমি দোষমুক্ত হইতে পারিবে না। তাহাকে স্পষ্টভাবে তাকীদের সহিত নিষেধ করিতে হইবে, যেন নিন্দিত ব্যক্তির প্রতি তোমার যে কর্তব্য রহিয়াছে তাহা প্রতিপালিত হয়। হাদীস শরীফে আসিয়াছে- কোন ব্যক্তি কোন মুসলমান ভ্রাতার গীবত করিলে শ্রবণকারী সেই নিন্দিত ভ্রাতার সাহায্য না করিয়া যদি তাহাকে নিঃসহায় পরিত্যাগ করে, তবে সে যখন অভাবে পতিত হইবে তখন আল্লাহ্ তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন।"

আন্তরিক গীবত—রসনা দ্বারা গীবত করা যেরূপ অবৈধ তদ্রূপ মনে মনে গীবত করাও অবৈধ। অন্যের নিকট অপরের দোষ প্রকাশ করা যেরূপ অন্যায় তদ্রূপ মনে মনে পরনিন্দা করাও অন্যায়। তুমি যদি কাহাকেও না দেখিয়া না শুনিয়া ও নিঃসন্দেহরূপে অবগত না হইয়া মন্দ বলিয়া ধারণা কর, তবে তুমি তাহার আন্তরিক গীবত করিলে।

রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "আল্লাহ্ মুসলমানের রক্ত, ধন ও তাহার প্রতি কুধারণা পোষণ হারাম করিয়াছেন। নিজে নিঃসন্দেহরূপে না জানিয়ে বা দুইজন ন্যায়পরায়ণ, ধার্মিক পুরুষের সাক্ষ্যে প্রমাণিত না হইলে অপরের প্রতি কুধারণা পোষণ করা নিষিদ্ধ। এইরূপ কুধারণা হইলে মনে করিবে শয়তান ইহা অন্তরে নিক্ষেপ করিয়া দিয়াছে। এই সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُوْا। অর্থাৎ "যদি তোমাদের নিকট কোন ফাসিক খবর লইয়া আসে ভালমত তাহ্‌কীক (অনুসন্ধান) করিয়া লও।" শয়তানতুল্য ফাসিক দুষ্কৃতিকারী দুর্বৃত্ত আর কেহই নাই।

বদগুমানের অনিষ্ট হইতে অব্যাহতির উপায়—অন্যের প্রতি মনে বদগুমান (কুধারণা পোষণ) করাই হারাম। কুধারণা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমার অন্তরে প্রবেশ করিলে তুমি যদি তৎপ্রতি আন্তরিক ঘৃণা পোষণ কর তবে এইরূপ কুধারণার দরুন তুমি অপরাধী হইবে না। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, কু-ধারণা হইতে মুসলমান একেবারে মুক্ত হইতে পারে না। তবে (ইহা হইতে) অব্যাহতি লাভের উপায় এই যে, সেই কুধারণাকে প্রমাণিত করিবার চেষ্টা না করিয়া যথাশক্তি সেই ব্যক্তিকে সৎ বলিয়া মনে করিবে।

বদগুমান প্রমাণার্থ চেষ্টার নিদর্শন—যাহার প্রতি তোমার বদগুমান হইয়াছে তৎপ্রতি যদি তোমার মন অপ্রসন্ন থাকে এবং পূর্বে তাহার সহিত তোমার যেরূপ বন্ধুত্বপূর্ণ আচার-ব্যবহার ছিল, এখন যদি ইহাতে কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তবে মনে করিবে বদগুমানকে সত্য প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা মনে মনে চলিতেছে। অপরপক্ষে, আন্তরিক ও মৌখিকভাবে তাহার সহিত পূর্ববৎ ব্যবহার চলিতে থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, ঐ বদগুমানকে নিশ্চিত প্রমাণ করিবার কোন চেষ্টা হয় নাই।

নিন্দাবাদ শ্রবণে কর্তব্য—কোন ধার্মিক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি হইতে অপরের নিন্দাবাদ শ্রবণ করিলেও তৎক্ষণাত ইহা অভ্রান্ত মনে করিবে না এবং তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াও সন্দেহ করিবে না। সংবাদদাতা ধার্মিক ন্যায়পরায়ণ হউক বা ফাসিক দুর্বৃত্ত হউক, কাহারও প্রতি বদগুমান করা জায়েয নহে। এমতাবস্থায়, সংবাদদাতার কথা বিশ্বাস করিতে বিলম্ব করিয়া মনে মনে চিন্তা করিবে যে, ঐ ব্যক্তির অবস্থা তোমার নিকট যেরূপ গোপন ছিল ও আছে, তদ্রূপ সংবাদদাতার অবস্থাও তোমার নিকট গোপন আছে। আর যদি জানিতে পার যে, সংবাদদাতার সহিত ঐ ব্যক্তির শত্রুতা আছে, তবে তাহার কথা গ্রহণ ও বিশ্বাস করিতে বিলম্ব করাই উত্তম ব্যবস্থা। সংবাদদাতা ন্যায়পরায়ণ পরম ধার্মিক হইলেও তৎপ্রতি অধিক ঝুঁকিয়া পড়া উচিত নহে।

বদগুমান দমনের উপায়- কাহারও অন্তরে অপরের প্রতি বদগুমান আসিলে তাহার সহিত পূর্বাপেক্ষা অধিক যত্নে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করা আবশ্যক। তাহা হইলে শয়তান ক্রুদ্ধ হইয়া আর অন্তরে বদগুমান নিক্ষেপ করিবে না এবং এইরূপে ক্রমশ অপরের প্রতি বদগুমান কমিয়া যাইবে।

নিন্দিত ব্যক্তির প্রতি উপদেশ—কাহারও দোষ নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিলেও লোকের সম্মুখে তাহার নিন্দা করা উচিত নহে, বরং নির্জনে তাহাকে উপদেশ দিবে। কিন্তু উপদেশ দানকালেও তাহাকে অপমানিত ও লজ্জিত করিবে না; আন্তরিক সমবেদনার সহিত নম্রভাবে তাহাকে উপদেশ দিবে। তাহা হইলে একজন মুসলমান ভ্রাতার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন এবং তাহাকে উপদেশ দান, এই দুইটি সৎকাজই সম্পন্ন হইল। ইহাদের পুণ্যও স্বতন্ত্রভাবে লাভ করিবে।

গীবত হইতে অব্যাহতির উপায়—গীবতের বাসনা মানবের অন্তরে একটি ভীষণ পীড়া এবং সযত্নে ইহার প্রতিষেধক ব্যবহার করা অবশ্য কর্তব্য। এই রোগের জ্ঞানমূলক ও অনুষ্ঠানমূলক এই দুই প্রকার ঔষধ আছে।

জ্ঞানমূলক ঔষধ- ইহাও আবার দুইভাগে বিভক্ত।

প্রথম—গীবতের ক্ষতি সম্পর্কে যে সকল হাদীস বর্ণিত আছে, উহা বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করত উহার মর্ম সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়া লওয়া এবং দৃঢ়রূপে বিশ্বাস স্থাপন করা যে, গীবত করার দরুন গীবতকারীর আমলনামা হইতে পুণ্যসমূহ নিন্দিত ব্যক্তির আমলনামায় স্থানান্তরিত করা হয়। এইরূপে নিন্দুকের সমস্ত পুণ্য নিঃশেষ হইয়া যায়।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "আগুন যেমন শুষ্ক কাষ্ঠ জ্বালাইয়া ভস্মীভূত করিয়া ফেলে, গীবতও তদ্রূপ মানুষের পুণ্যসমূহ ধ্বংস করিয়া ফেলে।" মনে কর, কাহারও পাপ অপেক্ষা একটি পুণ্য অধিক আছে, কিন্তু সে যে গীবত করিয়াছে ইহার পাপে তাহার পাপের পাল্লা ভারী হইয়া গেলে সে দোযখে নিক্ষিপ্ত হইবে।

দ্বিতীয়—স্বীয় দোষ অনুসন্ধান করিবে; স্বীয় দোষ দৃষ্টিগোচর হইলে মনে করিবে তোমার ন্যায় অপরের দোষ থাকাও অসম্ভব নহে। আর যদি নিজের দোষ দৃষ্টিগোচর না হয়, তবে মনে করিবে ইহাই তোমার জঘন্যতম দোষ। অপরপক্ষে, তুমি যথার্থই নির্দোষ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকিলে, গীবত করত মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করার মত গুরুতর অপরাধে নিজকে আর কলুষিত করিও না। মৃত মানুষের মাংস ভক্ষণ অপেক্ষা অধিক দোষের কার্য আর কিছুই নাই। অতএব তুমি যথার্থই নির্দোষ হইয়া থাকিলে গীবত দ্বারা নিজকে নতুনভাবে কলুষিত না করিয়া বরং যাহার অপার অনুগ্রহে তুমি নির্দোষ হওয়ার সুযোগ লাভ করিয়াছ তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। যদি নিঃসন্দেহে অবগত হও, অমুক ব্যক্তি কোন বিশেষ দোষে দুষ্ট, তবে এই ভাবিয়া গীবত হইতে বিরত হইবে যে, ইহজগতে কেহই একেবারে দোষমুক্ত নহে। আর একবার তুমি নিজের প্রতিও লক্ষ্য কর, দেখিবে শরীয়তের সূক্ষ্ম সীমারেখা হইতে স্বয়ং তুমিও বহুস্থানে পদস্খলিত হইয়াছ; উহাতে তোমার ত্রুটি-বিচ্যুতি যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন। তুমিই যখন শরীয়তের সীমার উপর সম্পূর্ণরূপে দৃঢ়পদ থাকিতে পার নাই, তখন অপরের পদস্খলনে তোমার বিস্ময়ের কি হেতু আছে?

অপরপক্ষে, জন্মগতভাবে কোন কোন লোকের এমন দোষ আছে যাহা পরিত্যাগ করা তাহাদের ক্ষমতাবহির্ভূত। (যেমন খঞ্জ, অন্ধ, বধির ইত্যাদি)। এইরূপ স্থলে সেই প্রকার লোকের নিন্দা করিলে প্রকারান্তরে সৃষ্টিকর্তারই নিন্দা করা হইয়া থাকে।

গীবতের কারণ ও অনুষ্ঠানমূলক ঔষধ—এ স্থলে গীবতের কারণ নির্দেশ করত উহার প্রতিকার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইবে। আটটি কারণে মানুষ গীবত করিয়া থাকে।

প্রথম কারণ—ক্রোধ। কেহ কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে ক্রোধের বশবর্তী হইয়া সে গীবতে লিপ্ত হয়। অতএব ক্রোধ দমন করিলেই এইরূপ গীবত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। অন্যের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া নিজকে দোযখে নিক্ষেপ করা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতার কাজ। ইহা নিজের প্রতি শত্রুতা ও স্বীয় অমঙ্গল কামনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি ক্রোধ দমন করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ প্রকাশ্যভাবে তাহাকে আহ্বান করিয়া লইবেন এবং বলিবেন, "বেহেশতের হুরগণের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা গ্রহণ কর।"

দ্বিতীয় কারণ—মানুষের সন্তোষ অর্জনের জন্য লোকে গীবত করিয়া থাকে। ইহার প্রতিকার ব্যবস্থা এই, উত্তমরূপে বুঝিয়া লইবে যে, মানুষের মনতুষ্টির চেষ্টায় আল্লাহ্‌র বিরাগভাজন হওয়া নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা ও মুর্খতার কার্য; বরং মানুষের ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির পাত্র হইয়াও আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভে সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক।

তৃতীয় কারণ—স্বীয় দোষ হইতে অব্যাহতির উদ্দেশ্যে অপরের দোষ উদ্‌ঘাটন। কাহারও কোন দোষ প্রকাশিত হইলে সে অপরের দোষ উল্লেখ করিয়া স্বীয় দোষ হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করে। মনে কর, এক ব্যক্তি হারাম দ্রব্য ভক্ষণ করে বা সরকারী ধন গ্রহণ করে। সেই ব্যক্তি স্বীয় দোষ হইতে অব্যাহতির উদ্দেশ্যে বলেন– "অমুক অমুক ব্যক্তি এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকে।" নিজের দোষ হইতে অব্যাহতি লাভের নিমিত্ত অপরের দোষ প্রকাশ করা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতার কাজ। আর দেখ, পাপীদের অনুসরণ করা ত উচিত নহে। এমতাবস্থায় 'অমুক ব্যক্তি পাপ করে' এই দৃষ্টান্ত দিয়া কি লাভ হইল এবং তোমার অকর্মের সমর্থনে কি যুক্তি পাওয়া গেল? দেখ, কেহ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিলে তুমি ত তাহার অনুসরণ কর না? তবে কেন তাহার অনুসরণে পাপাচরণ করিবে? তুমি স্বয়ং পাপ করিয়া একবার পাপী হইবে, আবার পরের দোষ প্রকাশ করিয়া পুনরায় পাপী হইবে কেন? অতএব অনুধাবন কর, তুমি যে লোকলজ্জার আশঙ্কায় অপরের দোষ ধরিতেছ এবং নিজের দোষ হইতে অব্যাহতির চেষ্টা করিতেছ, সেই আশঙ্কাও নিশ্চিত নহে; এই জগতে তোমার অপমান হইতেও পারে নাও হইতে পারে। কিন্তু তুমি যে গীবত করিলে, এইজন্য আল্লাহ্ যে ক্রুদ্ধ হইবেন, ইহা ধ্রুব সত্য; একদিন সেই ক্রোধাগ্নি তোমাকে দগ্ধ করিবেই করিবে। সেই অপমান ও আপদ অত্যন্ত ভীষণ হইবে। সুতরাং স্বীয় দোষ হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টায় অন্যের দোষ উল্লেখ করিতে আল্লাহ্‌র নিশ্চিত ক্রোধে পতিত হওয়া কখনও সঙ্গত নহে।

চতুর্থ কারণ—আত্ম-প্রশংসা। কোন কোন লোক আত্ম-প্রশংসা করিতে চায়; কিন্তু খোলাখুলিভাবে না করিয়া স্বীয় মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে অপর সম্মানিত লোকের নিন্দা করিতে থাকে। তেমন লোক বলিয়া থাকে– "অমুক ব্যক্তি কিছুই বুঝে না (অর্থাৎ আমি সমস্ত বুঝিয়া থাকি)।" অথবা বলে – "অমুক ব্যক্তি লোক দেখানো ইবাদত করিয়া থাকে (অর্থাৎ আমি এইরূপ করি না)।" বুদ্ধিমান লোকে এইরূপ ব্যক্তিকে মুর্খ দুর্বৃত্ত বলিয়া মনে করিবে এবং কেহই তাহাকে মহৎ ও নিষ্কলঙ্ক বলিয়া বিশ্বাস করিবে না। এইরূপে অপরের দোষ-কীর্তনে অজ্ঞ লোক তাহার ভক্ত হইলেও ইহাতে তাহার কি উপকার? অসহায়, দুর্বল ও নিতান্ত অক্ষম লোকের প্রশংসা লাভের আশায় পরম পরাক্রান্ত সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নিকট বিরাগভাজন ও অপমানিত হওয়াতে কি লাভ?

পঞ্চম কারণ—ঈর্ষা। যাঁহারা মান-সম্ভ্রম, বিদ্যা ও ধন অর্জন করিয়া লোকের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন, ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি উহা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাদের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করত অকারণে তাঁহাদের সহিত ঝগড়া-বিবাদ লাগইয়া দেয়। সে বুঝিতে পারে না যে, সে নিজের বিরুদ্ধেই ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হইয়াছে। সে ইহলোকে নিজেকে মানসিক যাতনা ও হিংসানলে দগ্ধ করে এবং পরলোকে আবার গীবতের পাপানলে দগ্ধ হইতে ইচ্ছা করে। সুতরাং ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি উভয় লোকে

আল্লাহ্‌র নে'আমত হইতে বঞ্চিত থাকে। ঈর্ষাজনিত গীবত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য তাহাদের অবগত হওয়া আবশ্যক যে, আল্লাহ্ যাঁহাদিগকে সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধন দান করিয়াছেন, হিংসুকের হিংসায় উহা মোটেই লাঘব হয় না, বরং ক্রমশ বাড়িয়া যায়।

ষষ্ঠ কারণ—উপহাস ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ। অধিকাংশ সময় মানুষ অন্যকে কলঙ্কিত ও অপদস্থ করিবার উদ্দেশ্যে তাহার ক্রিয়া-কলাপ লইয়া উপহাস ও ঠাট্টা-বিদ্রূপে মত্ত হয়। উপহাসক বুঝিতে পারে না যে, এইরূপে উপহাস করিয়া সে অপরকে লোকের নিকট যতদূর অপদস্থ করিতেছে তদপেক্ষা অধিক সে নিজে আল্লাহ্‌র নিকট অপদস্থ হইতেছে।

প্রিয় পাঠক, অনুধাবন কর, উপহাসাস্পদের পাপের বোঝা যদি কিয়ামত দিবস উপহাসকের পৃষ্ঠে উঠাইয়া দিয়া গর্দভের মত তাহাকে দোযখের দিকে লইয়া যাওয়া হয়, তবে ইহজগতে উপহাসাস্পদ হওয়াই উত্তম। বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিলে সে কখনও অপরকে উপহাস করিবে না। তাহা হইলে সে উপহাস ও ঠাট্টা-বিদ্রূপজনিত গীবত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবে।

সপ্তম কারণ—অসতর্কতা। পরহেযগার ব্যক্তিগণ অপরকে পাপ করিতে দেখিয়া দুঃখিত হন এবং পাপীর দুর্গতিতে দুঃখিত হওয়াও সঙ্গত। কিন্তু তাঁহারা পাপের উল্লেখকালে পাপাচারীর নামও উচ্চারণ করিয়া ফেলেন এবং অসতর্কতাবশত লক্ষ্য করেন না যে, ইহা গীবতের মধ্যে গণ্য। এই প্রকার গীবত হইতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে তাহাদের অবগত হওয়া আবশ্যক যে, অপরের দুর্গতিতে দুঃখিত হইলে পুণ্য হয় সত্য, কিন্তু অসতর্ক লোক অনায়াসে পুণ্য লাভ করিবে, বিদ্বেষপরায়ণ শয়তান ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার দ্বারা পাপাচারীর নামও ব্যক্ত করাইয়া ফেলে এবং এইরূপে তিনি অপরের বিপত্তিতে দুঃখিত হইয়া যে পুণ্য লাভ করিতেন ইহা গীবতের পাপে ধ্বংস হইয়া যায়।

অষ্টম কারণ—মূর্খতা। অপরকে পাপে লিপ্ত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলে বা বিস্ময় প্রকাশ করিলে পুণ্য হয়। কিন্তু ক্রোধ বা বিস্ময় প্রকাশকালে পাপাচারীর নাম লইলে লোকে তাহার পাপকার্য সম্বন্ধে অবগত হওয়ার সুযোগ পায় এবং ইহাতে উক্ত পুণ্য ধ্বংস হয়। মূর্খতার দরুন মানুষ অজ্ঞাতসারে এই প্রকার গীবত করিয়া থাকে। এইরূপ গীবত হইতে মুক্তি লাভের নিমিত্ত স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ক্রোধ, বিস্ময় বা বিরক্তিসূচক বাক্য সাধারণভাবে উচ্চারণ করা আবশ্যক, পাপাচারীর নাম কখনও উল্লেখ করা সঙ্গত নহে।

বিশেষ কারণে গীবত সঙ্গত—মিথ্যা বলা যেমন হারাম গীবতও তদ্রূপ হারাম। শরীয়তসম্মত অপরিহার্য কারণ না হইলে উহা সঙ্গত ও নির্দোষ হইতে পারে না। ছয়টি স্থানে পরের দোষ ব্যক্ত করা চলে।

প্রথম স্থান—বাদশাহ বা বিচারকের নিকট বিচার প্রার্থীরূপে উৎপীড়কের উৎপীড়নের বিষয় বলা বৈধ। এইরূপ উৎপীড়কের কোন সাহায্যকারীর নিকটও উৎপীড়নের বিষয় বলাতে কোন দোষ নাই। কিন্তু উৎপীড়ককে শাস্তি দিবার বা উৎপীড়িতকে সাহায্য করিবার যাহাদের কোন শক্তি নাই তাহাদের নিকট উৎপীড়নের বিষয় বলা সঙ্গত নহে। হযরত ইব্‌ন সিরীনের নিকট এক ব্যক্তি হাজ্জাজের উৎপীড়নের বিষয় বর্ণনা করিতে লাগিলে তিনি বলিলেন- "আল্লাহ্ হাজ্জাজ হইতে যেরূপ প্রজা নিপীড়নের নিমিত্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন, তদ্রূপ তিনি তাহার নিন্দুক হইতেও তাহার নিন্দার প্রতিশোধ লইবেন।"

দ্বিতীয় স্থান—কোন স্থানে অসৎ ও অসঙ্গত কাজ চলিতেছে বা অশান্তির সৃষ্টি হইতেছে দেখিয়া উহা নিবারণ করিতে পারেন এবং দুরাচারীদিগকে দুষ্কর্ম হইতে বিরত রাখিতে সমর্থ, তেমন ব্যক্তির নিকট উহা প্রকাশ করা অসঙ্গত নহে। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু একদা হযরত তাল্‌হা বা হযরত ওসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুমার নিকট দিয়া যাইবার কালে তাঁহাকে সালাম দিলেন; কিন্তু তিনি ইহার উত্তর দেন নাই। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এই বিষয়ে অভিযোগ করেন। তিনি ঐ পক্ষের নিকট হইতে সালামের জওয়াব না দিবার কৈফিয়ত চাহিলেন। কিন্তু হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিযোগকার্যকে গীবতের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই।

তৃতীয় স্থান—মুফতি হইতে ফত্‌ওয়া অর্থাৎ ধর্মব্যবস্থা লওয়ার উদ্দেশ্যে কাহারও দোষযুক্ত প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করারও অনুমতি আছে; যেমন আমার সহধর্মিণী, পিতা কিংবা অমুক ব্যক্তি আমার সঙ্গে এইরূপ আচরণ করে। এইরূপ স্থানে দোষী ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করিয়া সাধারণভাবে জিজ্ঞাসা করাই উত্তম ব্যবস্থা; যথা ঃ কোন ব্যক্তি তাহার স্বামী, পুত্র কিংবা অমুকের সহিত এইরূপ আচরণ করিয়া থাকে, এই সম্বন্ধে আপনি কি বলেন? কিন্তু এইরূপ ফত্‌ওয়া জিজ্ঞাসাকালে দোষী ব্যক্তির পরিচয় প্রদানেরও অনুমতি রহিয়াছে। তাহা হইলে মুফতী প্রকৃত ঘটনা অবগত হইয়া সহজে উত্তর দিতে পারেন।

একদা আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিলেন- "আবূ সুফিয়ান অত্যন্ত কৃপণ, তিনি আমার সন্তানাদির ভরণ-পোষণের উপযোগী অর্থ প্রদান করেন না। যদি আমি তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোন জিনিস লইয়া খরচ করি তবে যুক্তিযুক্ত হইবে কি?" তিনি বলিলেন- "যে পরিমাণ জিনিসের প্রয়োজন ন্যায়-সঙ্গতভাবে উহা গ্রহণ কর। কিন্তু কৃপণতা ও সন্তানাদির উপর অত্যাচারের কথা বলিলে গীবত হয়।" তবে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ফত্‌ওয়া জিজ্ঞাসাকালে দোষ ব্যক্ত করা সঙ্গত বলিয়াছেন।

চতুর্থ স্থান—অনিষ্টকর ব্যক্তির ক্ষতি হইতে লোককে রক্ষার উদ্দেশ্যে তাহার দোষ ব্যক্ত করা বৈধ। মনে কর, কোন বিদ্‌আতী ব্যক্তি সমাজে শরীয়ত বহির্ভূত নতুন